2002

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ☐ ১১তম সংখ্যা

১৫ ডিসেম্বর, ২০০২ ঈসাব্দ

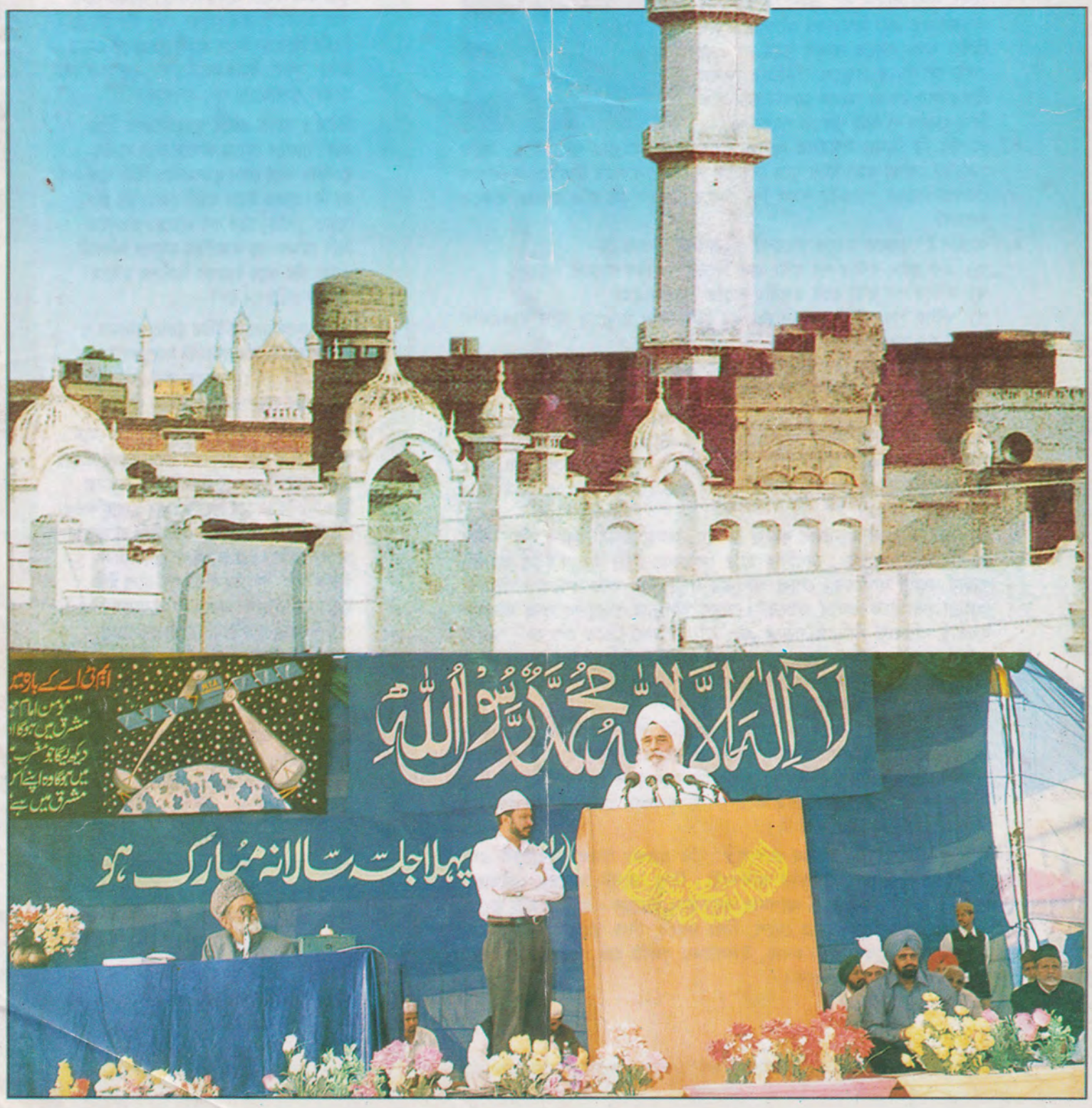

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

বয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মুসলমানদের আদেশ দিয়েছেন ঃ 'ফা ইযা রায়ায়তুমুহু ফাবায়েউহু ওয়ালাও হাবওয়ান আলাস সালজি ফা ইন্নাহু খলীফাতুল্লাহিল মাহদিউ' অর্থাৎ যখন তোমরা তার [অর্থাৎ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর] সন্ধান পাবে তখন তার বয়াত করবে যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল্ মাহ্দী [সুনান ইবনে মাজাহ্ - বাবু খুরুজিল মাহ্দী]।

দু'টি কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমটি হলো স্বয়ং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে মানার জন্যে। সুতরাং ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে মান্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

দ্বিতীয় ঃ 'বয়াত' কথাটি হলো নিজেকে বিক্রি করা। সাধারণ কোনো নায়েবে রসূল বা পীর-মুর্শেদের কাছে কোন মুসলমানকে বিক্রি হতে বলা হয় নি। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর হাতে 'বয়াত' (বিক্রি) হতে বলা হয়েছে। এতদ্দ্বারা তিনি যে কত বড় আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী একথা তাঁর কাছে বয়াতের নির্দেশের মাধ্যমে সহজেই প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং মুসলমানদের উচিত যুগের আলামত ও নিদর্শন যাচাই করে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে মান্য করা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের রজ্জু শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা।

আর আমরা যারা ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে মেনে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য হয়েছি তাদের উচিত বয়াতের তাৎপর্য উপলব্ধি করা। আমরা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছি মহান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট ইমামের হাতে। এখন তিনি যা বলবেন তা মানতে হবে। সেভাবেই আমাদের জীবন গড়তে হবে। বয়াতের দশটি শর্ত হলো খাঁটি ইসলামের সারাংশ। এগুলোকে মনোযোগ দিয়ে পড়ে উপলব্ধি করে দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়ন করাই হবে আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য।

একদল লোক বলে, আহমদী হলে মানুষ নাকি কাফির হয়। প্রকৃতপক্ষে আহমদী হবার দশটি শর্ত মানলে মানুষ আল্লাহ্‌র ওলীতে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের প্রত্যেককে ওলীউল্লাহ্ হবার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

যে আহমদী নিজ জীবনে বয়াতের দশটি শর্ত পূর্ণ করে সে 'মূর্তিমান তবলীগে' পরিণত হয়। সে কথা না বললেও তার আচার-আচরণ ও জীবন মানুষকে আকৃষ্ট করতে বাধ্য। সুতরাং তবলীগের ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্যও বয়াতের শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ্ আমাদের তৌফীক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ॥ ১১তম সংখ্যা

১ পৌষ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ৯ শওয়াল ১৪২৩ হিঃ কাঃ
১৫ ফাতাহ্ ১৩৮১ হিঃ শাঃ ১৫ ডিসেম্বর ২০০২ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০◆ভারত টাঃ ২০০ ◆অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	-	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

ধর্মীয় জগতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মূল্য নেই

কথায় বলে- সত্য গুড় অন্ধকার রাত্রেও মিঠা। সত্য চিরকাল সত্যই তা কেউ মানুক চাই না মানুক। আর মিথ্যা চিরকালই মিথ্যা। সারা দুনিয়ার মানুষ একত্রিত হয়েও যদি বলে- মিথ্যা কথা বলা বড়ই পুণ্যের কাজ তাহলেই কি তা গ্রহণীয় হয়ে যাবে? সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে কোন নবীর নবুওয়তই কখনো গ্রহণযোগ্য হয় নি। নবী আসেন একা। সারা দুনিয়া তাঁর বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়। সবাই বলে 'মানিনা' 'মানবো না' অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ প্রবল ও প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখেও নবীর সত্যতাকে প্রমাণ করে তবে ছাড়েন। নবী যে সমাজে আবির্ভূত হন সে সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠরা তখন আস্তে আস্তে পরিণত হতে থাকে সংখ্যালঘিষ্ঠে। ধর্মের ইতিহাসে কম করে হলেও এ ঘটনা ঘটেছে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার। আল্ কুরআনেও আল্লাহ্তাআলা বলেছেন- আর পৃথিবীতে যারা আছে তুমি যদি তাদের অধিকাংশের অনুসরণ করো তাহলো তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রষ্ট করবে (সূরা আল আনআম ঃ ১১৭ আয়াতাংশ)। এ দুনিয়াতে ইবলীস, নমরূদ, সাদ্দাদ ফেরাউন, কংশ, আবূ জাহল ও তাদের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তিতে মদমত্ত হয়ে যখন আল্লাহ্তাআলার কর্ম-পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করার জন্যে তাদের অপবিত্র মাথাকে খাড়া করেছে আল্লাহ্তাআলা তাদের কাউকেই তাদের মাথা না গুঁড়িয়ে ছাড়েন নি। তাদের ধ্বংস করে তবে ছেড়েছেন। অপরপক্ষে সমাজের দৃষ্টিতে হেয় দুর্বল আর্থিকভাবে অভাব অনটনক্লিষ্ট নগ্নপদ ও নগ্ন দেহের অধিকারী কতিপয় ব্যক্তি যখন আল্লাহ্তাআলার কর্ম-পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সমাগত নবী ও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন এবং 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' নীতিকে অবলম্বন করেছেন আল্লাহ্তাআলা তাদের মাধ্যমে তখন একটি বিরাট বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন করে একটি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে দিয়েছেন অর্থাৎ নতুন সভ্যতার জন্ম দিয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রবল দানবটি তার হিংস্র থাবা, লোমহর্ষক ও বিকট চিৎকার দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠের ঐকান্তিক চেষ্টা, সাধনা এবং প্রবল উদ্যম ও সাহসিকতাকে নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট করতে সক্ষম হয় নি।

আহমদীয়তের বিরোধীরা কুরআন ও হাদীসের প্রমাণে আহমদীয়তকে পরাস্ত করতে না পেরে সংখ্যাগরিষ্ঠতার যূপ-কাষ্ঠে নিরীহ আহমদীদেরকে বলিদানের জন্যে বারে বারে চেষ্টা করছে। তাদের যুক্তি যে উপরোক্ত আলোচনার ধোপে টেকে না তা তাকে উপলব্ধি করার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। দয়া করে দেশবাসী ভেবে দেখবেন কি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়- অবশ্য রাজনৈতিক অঙ্গণে এর মূল্য থাকলেও থাকতে পারে ধর্মীয় ক্ষেত্রে মোটেও নেই- তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তিতে বাংলাদেশের প্রায় ২ কোটির মত অমুসলমানকে মুসলমান করে নেন না কেন? বা ভারত তার দেশের প্রায় ষোল কোটি মুসলমানকে হিন্দু বানিয়ে নেয় না কেন? আর এ যুক্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি আপনাদের দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় তাহলে বা তা ঠেকাবেন কোন্ অধিকারে। বর্তমানে প্রায় ৬০০ কোটি মানব সন্তানের মধ্যে মুসলমান টেনে হিঁচড়ে হলেও ১২৫ কোটি হতে পারে আর তা-ও আজ পনর শ' বছরের ফসল। এ হেন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কষ্টিপাথরে খোদ ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করতে যে পারবেন না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া আপনার যুক্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় দল বিধায় মুসলমানদিগকে খৃষ্ট বা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করা উচিত নয় কি?

কতিপয় হাদীস ও ঐতিহাসিক বিষয়কে কদর্থ করে আহমদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদের ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এদেশের কোন কোন স্বার্থান্বেষী মহল। এ প্রসঙ্গে আমাদের বই-পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবুও আমরা পুনরায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই, আমরা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খাতামান্নাবীঈন তথা সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ শরীয়তধারী স্বাধীন স্বতন্ত্র নবী বলে পূর্ণ ঈমান রাখি। তাঁর পরে এ ধরনের কোন নবী আসতে পারে না। তাঁর পরে তাঁর (সঃ) গোলামী অনুসরণ ও অনুকরণে 'উম্মতী নবী' আসার দরজা খোলা রয়েছে (সূরাতুন নিসার ৭০ আয়াত দ্রষ্টব্য)। হযরত আয়েশা (রাঃ)) সহ বহু সলফে সালেহীন বুযূর্গও এ অভিমত পোষণ করতেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের বই-পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবুও আমরা পুনরায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই, আমরা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খাতামান্নাবীঈন তথা সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ শরীয়তধারী স্বাধীন স্বতন্ত্র নবী বলে পূর্ণ ঈমান রাখি। এরপরও যারা আমাদের প্রতি মিথ্যারোপ করে বলবে যে, আমরা খতমে নবুওয়তে বিশ্বাসী নই সেক্ষেত্রে আমরা শুধু বলবো- লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন (মিথ্যেবাদীদের ওপরে আল্লাহ্র অভিসম্পত বর্ষিত হোক)।

-নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
■ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ - ৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
■ হাদীস শরীফ ঃ আল্লাহ্‌র উপর আশা-ভরসা	ঃ অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩-৪
■ অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ মৌঃ মুহাম্মদ আজিম উদ্দীন আহমদ	৪
■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্‌র 'নূর' সিফাতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৬
■ ঐশী-বাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন	৬-৭
■ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	৮-৯
■ মুনাজাতে রসূল (সঃ) - মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১০
■ স্মৃতি কণা - ছোট কিন্তু প্রাণবন্ত	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী	১১
■ কবিতা ঃ নামায	ঃ জনাব শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ	১১
■ ছোটদের পাতা ঃ এস হাদীস শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১২-১৩
■ Moons of light	ঃ Maulana Bashir Orchard	১৪-১৫
■ কবিতা ঃ Way to get to Peace : Seema Chowdhury	ঃ অনুবাদ - জনাব মীর মোবাশ্বের আলী	১৫
■ নতুনদের পাতা		
● পর্দা প্রগতির দিশারী	ঃ জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	১৬-১৭
● হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা	ঃ জনাব এহসানুল হাবীব (জয়)	১৮-১৯
● প্রকৃত মুসলমান কে	ঃ মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন	২০-২১
● মরহুম আব্দুল লতীফ স্মরণে	ঃ ডঃ মেজর অবঃ আসাদুজ্জামান	২২
● কুরআন মজীদের অত্যুজ্জ্বল শান ও মকাম	ঃ মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের	২৩-২৫
■ সংবাদ	ঃ	২৬-২৭

প্রচ্ছদ ঃ দারুল আমান কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত সালানা জলসা-২০০১-এর একটি অধিবেশনের দৃশ্য।

কালামুল ইমাম

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার ঈমানবর্ধক ঘটনা

(২) "খলীফা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হাসান সাহেব পাতিয়ালার প্রধানমন্ত্রী কোন পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টে পড়েছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে বারে বারে দোয়ার দরখাস্ত আসতে থাকে। ঘটনাক্রমে একদিন এ ইলহাম হলো ঃ

চাল রাহি হ্যা নাসীম রহমাত কি
যো দুআ কি জায়ে কবুল হ্যা আজ॥

অর্থাৎ ঃ করুণার মলয় সমীরণ চলছে
যে দোয়া করা হবে তা আজ গৃহিত হবে॥

এ সময়ে আমার মনে আসলো যে, আজ তাঁর জন্যে দোয়া করবো। সুতরাং দোয়া করা হলো আর কিছু দিন পরে তিনি পরীক্ষা থেকে মুক্তি পেলেন এবং পত্র মারফত তাঁর মুক্তির খবর দিলেন" (নযূলুল মসীহ্, পৃষ্ঠা ২২৫, রূহানী খাযায়েন, ১৮ খন্ড, পৃষ্ঠা ৬০৩)।

(৩)"একবার নবাব আলী মুহাম্মদ খান মরহুম, লুধিয়ানার ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাকে পত্র লেখেন, আমার কয়েকটি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। দোয়া করবেন যেন তা খুলে যায়। যখন আমি দোয়া করলাম তখন আমার নিকট ইলহাম হলো, 'খুলে যাবে'। আমি পত্র মারফত তাঁকে জানিয়ে দিই। কেবল ২/৪ দিন পরেই আয়ের পথ খুলে গেলো আর তাঁর খুবই বিশ্বাস হলো। পরে একবার তাঁর নিজের কয়েকটি গোপনীয় উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আমাকে একটি পত্র পাঠান আর যে মুহূর্তে তিনি ডাকে পত্র ফেলেন ঐ সময়েই আমার নিকট ইলহাম হলো, 'এ বিষয় তার নিকট থেকে পত্র আসছে'। তখন আমি দেরী না করে তার নিকট পত্র লিখলাম, এ বিষয়ে আপনি পত্র পাঠাবেন। পরের দিন ঐ পত্র এসে গেলো আর যখন আমার চিঠি তিনি পেলেন তখন তিনি বিস্ময়ের বিস্ময়ের পাথারে নিমজ্জিত হলেন যে, এ গায়েবের সংবাদ কীভাবে পাওয়া গেল। কেননা, আমার এ গোপনীয় খবর কেউ জানতো না। আর তাঁর বিশ্বাস এতটা বেড়ে গেলো যে, তিনি ভালবাসা ও প্রেমে বিনীত হয়ে গেলেন" (হাকীকাতুল ওহী ঃ ২৪৬ পৃষ্ঠা, রূহানী খাযায়েন ২২ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৭-২৫৮)।

(৪) "এ বন্ধু খুবই সমস্যার সময়ে পত্র লিখেছেনঃ তার এক নিকটাত্মীয় সঙ্গিন মোকদ্দমায় ধরা পড়েছে। মুক্তির কোন পথই দেখা যাচ্ছে না। আর দোয়ার জন্যে আবেদন করেছেন। সুতরাং ঐ রাতেই নির্মল সময়ের সুযোগ লাভ হলো আর গ্রহণীয়তার চিহ্ন থেকে এক আর্যকে সংবাদ দেয়া হলো। কয়েক দিন পরে সংবাদ পাওয়া গেলো, বাদী যে মামলা করেছিলো হঠাৎ সে-ই মারা গেছে আর গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি ছাড়া পেয়েছে। অতঃপর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র" (তিরিয়াকুল কুলূব, পৃষ্ঠা ৫৯, রূহানী খাযায়েন ১৫ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬০)।

(৫) "একবার আমাদের এক নিষ্ঠাবান বন্ধু মাদ্রাজের ব্যবসায়ী আব্দুর রহমান সাহেবের জন্যে যখন দোয়া করা হলো তখন ইলহাম হলো ঃ

কাদের হ্যায় ওহ্ বারগাহ্ টোটা কাম বানা দে
বানা বানায়া তোড় দে কোই উসকা ভেদ না পাওয়ে

অর্থ ঃ সর্বশক্তিমান তিনি, যিনি ভাঙ্গা কাজ জোড়া লাগিয়ে দেন আর বানানো কাজ ভেঙ্গে দেন, কেউ এর রহস্য জানতে পারে না।

এ ছিলো একটি শুভ সংবাদ। এটা ছিলো তার দুঃখ দূর করার জন্যে। সুতরাং কয়েক সপ্তাহের পরেই খোদাতাআলা তাকে সে কষ্ট থেকে মুক্তি দেন"।

(নযূলুল মসীহ্, পৃষ্ঠা ২৩৩, রূহানী খাযায়েন, ১৮ খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১১)।

উপস্থাপন ও অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

সূরাতুল আ'রাফ - ৭

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَاۤ
اِلٰى مُوْسٰۤى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ
الْحَجَرَ ؕ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ
عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ
وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا
رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۱﴾

১৬১। আর আমরা তাদেরকে বারটি গোত্রে অর্থাৎ জাতিতে বিভক্ত করলাম। এবং মূসার নিকট তার জাতি যখন পানি চেয়েছিল তখন আমরা তার প্রতি ওহী করেছিলাম, 'তুমি তোমার লাঠি দিয়ে পাথরটির ওপর আঘাত কর।[১০৬১-ক] তখন তা থেকে বারটি ঝরণা ফুটে বের হলো, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাট অবশ্যই চিনে নিল। এবং আমরা তাদের ওপর মেঘের ছায়া দিয়েছিলাম আর আমরা তাদের জন্য মান্ন ও সালওয়া নাযেল করেছিলাম (এবং

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا
حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۶۲﴾

১৬২। এবং (স্মরণ কর) যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, "তোমরা এ শহরে বসবাস কর এবং এতে যেখান থেকে চাও খাও আর বল, '(হে আল্লাহ্) আমাদের বোঝা হালকা কর' এবং অনুগত হয়ে সদর-দরোজা দিয়ে প্রবেশ কর। আমরা তোমাদেরকে তোমাদের পাপ ক্ষমা করবো, আমরা সৎকর্মপরায়ণদের অবশ্যই বাড়াবো।"

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ
لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا
يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۳﴾

১৬৩। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল তারা তা অন্য এক কথায় বদলে ফেললো, সুতরাং আমরা তাদের ওপর আকাশ থেকে শাস্তি পাঠালাম, কেননা তারা যুলুম করেছিল।

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ
اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ
سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ
نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۱۶۴﴾

১৬৪। এবং তুমি তাদেরকে সেই শহর[১০৬৩] সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর যা সাগর তীরে অবস্থিত ছিল। যখন তারা সাবাতের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করতো, তাদের সাবাতের দিনে যখন তাদের মাছ (পানিতে ভেসে) ঝাঁকে ঝাঁকে[১০৬৪] তাদের নিকট আসতো আর যেদিন তারা সাবাত[১০৬৪-ক] পালন করতো না, তাদের নিকট তারা আসতো না, এভাবেই আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করতাম, কেননা তারা মন্দকাজ করতো।

১০৬২। তারা (ইহুদী জাতি) নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছিল এবং সত্যের সংগ্রামের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে নি।

১০৬৩। এ আয়াতে উল্লেখিত "আল্ কারিয়াহ্" (শহরটি) লোহিত সাগরের তীরবর্তী 'আইলা' (Elath) বলে কথিত শহরকে বুঝায়। এটি লোহিত সাগরের উত্তর-পূর্ব শাখায় 'আয়েলা-নিটিক' উপসাগরের তীরে অবস্থিত (যার নাম স্থানের নামানুসারে হয়েছে) এবং ইসরাঈল জাতির উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবার এটাই শেষ সীমা বলে উল্লেখিত হয়েছে (১-রাজাবলী- ৯ঃ২৬ এবং ২-বংশাবলী- ৮ঃ১৭)। হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে এ শহর ইসরাঈলীদের অধিকারভুক্ত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে 'উয্যিয়াহ্'(Uzziah) তা পুনর্বিজয় করেছিল এবং 'আহাযের' সময় আবার তারা তা হারায় (এনসাই বিব, এবং জিউস, এনসাইক্লো)

১০৬৪। 'শুররাআন' (পানির উপর দিয়ে)-এর আর এক অর্থ তারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিল।

১০৬৪-ক। সাব্বাত (সাপ্তাহিক কর্ম-বিরতি)-এর দিন যখন কোন মৎস্য ধরা হতো না, তখন তারা সহজাত প্রবণতার দরুন বুঝতে পারতো, তাদের জন্য নিরাপদ সময় কোন্‌টি এবং এ কারণে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে পানির ওপরে ভেসে সাব্বাতের দিনে উপকূলের নিকটবর্তী হতো। এ ঘটনায় ইহুদীরা লোভ সংবরণ করতে পারে নি এবং তারা মাছ ধরবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল আর এভাবে তারা পবিত্র বিধানের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করেছিল।

হাদীস শরীফ

আল্লাহ্‌র উপর আশা ভরসা

কুরআন ঃ

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا
مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ
اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۴﴾

অর্থাৎ তুমি বল, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের আত্মার উপরে যুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী (সূরা যুমার ঃ ৫৪)।

হাদীস ঃ

হযরত আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ যে ব্যক্তি একটি সৎ কাজ করবে, সে এর দশগুণ অথবা এর চাইতে বেশি সওয়াব পাবে, আর যে ব্যক্তি একটি পাপ করবে সে তেমনি একটি পাপের শাস্তি পাবে অথবা আমি তাকে মাফ করে দিব। আর যে ব্যক্তি আমার এক বিঘত নিকটবর্তী হবে আমি তার এক হাত নিকটবর্তী হবো, আর যে ব্যক্তি আমার এক হাত নিকটবর্তী হবে আমি তার দু'হাত নিকটবর্তী হবো। যে ব্যক্তি হেঁটে হেঁটে আমার নিকটবর্তী হবে আমি দৌড়ে তার কাছে যাবো, যে ব্যক্তি পৃথিবী সমান পাপ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে অথচ সে আমার সাথে কোন কিছু শরীক করে নি আমি তার সাথে অনুরূপ ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করবো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

মানুষ বড় অসহায়। এর অবসানের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌তাআলা যুগে যুগে নবী প্রেরণ করেছেন, নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে স্রষ্টার দিকে আহ্বান করেছেন, যাঁরা মানুষকে অবগত করেছেন যে, তোমাদের

প্রভু-প্রতিপালক ঐ সত্তা যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। সকল বিষয়ের মালিক তিনি সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। তাহলে তোমরা সকল অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি পাবে। মানুষের আশ্রয়স্থল আল্লাহ্‌তাআলা। তিনি মানুষকে সকল সমস্যা হতে মুক্তি দিয়ে থাকেন। বস্তুত মানুষের সকল বিষয়ের ভরসাস্থল হলেন আল্লাহ্‌তাআলা।

মানুষের মাঝে পাপ ও পুণ্যের সমাহার রয়েছে। মানুষ চেষ্টা করে সে যেন পাপ হতে দূরে থাকে কিন্তু নফসে আম্মারার (অবাধ্য আত্মা) কারণে সে তা পারে না। খোদাতাআলা এমন মানুষকে নিজে ক্ষমা করে থাকেন। তবে এর জন্য শর্ত হলো, সে যেন বিদ্রোহী ও সীমালংঘনকারী না হয়। হাদীসটিতে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) এমন সকল মানুষকে আশার বাণী শুনাচ্ছেন, যে সীমালঙ্ঘনকারী ও বিদ্রোহী নয় অর্থাৎ শিরক করে না। আল্লাহ্ বলেছেন, শিরক হলো সবচেয়ে বড় পাপ যা তিনি ক্ষমা করবেন না। মানুষ যদি খোদার দিকে ধাবিত হয় এবং এর মাঝে যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয় আর তা যদি পৃথিবী সমানও হয় তবে আল্লাহ্‌তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

আমাদের জীবনে আমরা নিজেদের দুর্বলতার কারণে কখনও বলতে পারি না যে, আমরা মুক্তি পাবো। হ্যাঁ, তবে আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা, ভরসা রেখে আশা করা যায় যে, তিনি তাঁর রহমত দ্বারা ক্ষমা করে দিতে পারেন। আর এ আশাই আমাদের অসহায়ত্বের অবসান করতে পারে। আল্লাহ্ করুন, তিনি যেন তাঁর কৃপা দ্বারা তাঁর প্রতি আশা ও ভরসা করার তৌফীক দান করেন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

চশমায়ে মসীহী

(৪র্থ কিস্তি)

এটা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য যে, পাদ্‌রী সাহেবদের ধর্মগ্রন্থগুলো এমনই দুরবস্থায় পতিত যে, তা প্রকাশ করতেও লজ্জাবোধ হয়। তারা শুধু নিজেদের হঠকারিতায় কতকগুলো ধর্মগ্রন্থকে স্বর্গীয় ধর্মগ্রন্থ ও কতকগুলোকে কৃত্রিম বলে নির্দেশ করেন। তাঁরা চারটি ইঞ্জিলকে মূল ও সত্য বলে নির্দেশ করেন এবং শুধু কল্পনা ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অবশিষ্ট প্রায় ৫৬ খানা ইঞ্জিলকে কৃত্রিম বলে প্রচার করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁদের নিকট কোন প্রমাণ নেই। প্রচলিত ইঞ্জিল ও অন্যান্য ইঞ্জিলে অনৈক্য দেখা যায় বলে তাঁরা নিজেদের মতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু সমালোচক পণ্ডিতগণ বলেন, এ ইঞ্জিলসমূহ কৃত্রিম কি ঐ ইঞ্জিলসমূহ কৃত্রিম তা আমরা সঠিক বলতে পারি না। তজ্জন্যই সম্রাট এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেককালে, লন্ডনের পাদ্রীগণ যে সকল ইঞ্জিলকে লোকেরা কৃত্রিম বলে ধারণা করে, সেগুলোকে প্রচলিত চারটি ইঞ্জিলের সাথে একত্র করে একই গ্রন্থে বাঁধাই করত তাঁকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। এ সংগৃহীত গ্রন্থের এক কপি আমার নিকট মজুদ আছে। অতএব চিন্তার বিষয়, যদি উক্ত ইঞ্জিলসমূহ প্রকৃত পক্ষেই অপ্রকৃত ও কৃত্রিম হত, তবে পবিত্র ও অপবিত্র পুস্তকসমূহ একই গ্রন্থরূপে বাঁধাই করায় অনেক বড় পাপাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলতঃ এরা সন্তোষজনকভাবে কোন গ্রন্থকেই মৌলিক বলে নির্দেশ করতে পারেন না, কিংবা কৃত্রিম বলে পরিহার করতেও পারেন না। তাঁরা শুধু নিজেদের মতে এ মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন এবং ঐকান্তিক অন্ধ-বিশ্বাস ও হঠকারিতাবশত কুরআন শরীফের অনুকূল ইঞ্জিলগুলোকেই কৃত্রিম বলে প্রকাশ করেন। বার্ণাবাসের ইঞ্জিল (যাতে শেষ যুগের নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী লেখা আছে), শুধু এ কারণেই কৃত্রিম বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, এতে হযরত (সঃ) সম্বন্ধে অতি স্পষ্ট ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। সেল সাহেব তাঁর অনূদিত ইংরাজী কুরআনে এক খ্রীষ্টান সাহেবের (সন্ন্যাসীর) ইঞ্জিল পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের বিবরণ লিখে গিয়েছেন। বস্তুত তাঁরা যেসকল ইঞ্জিলকে কৃত্রিম বলে নির্দেশ করেন, নিম্নলিখিত দু' কারণেই সেগুলোকে কৃত্রিম মনে করেন; (এক) এ বিবরণী ও পুস্তকগুলো প্রচলিত চার ইঞ্জিলের অনুরূপ নয়; (দুই) এ বিবরণী ও পুস্তকগুলো কুরআনের সাথে কিছু পরিমাণে অনুরূপ। কোন কোন অসাধু ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের মানব এ পুস্তক কৃত্রিম, এ কথা সর্বদাবীসম্মত বলে কল্পনা করতঃ (১) বলে, এ কৃত্রিম পুস্তকের বিবরণীই কুরআনে লিখা রয়েছে এবং এরূপে অজ্ঞলোকদিগকে প্রতারণা করে। বাস্তবিক তৎকালীন কোন ধর্মশাস্ত্র কৃত্রিম কি মৌলিক, খোদার নতুন ওহী বা প্রত্যাদেশবাণী ব্যতীত সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। খোদার ওহীতে যে বিবরণী সত্য বলে প্রকাশিত, অজ্ঞ মানব তা মিথ্যা বলে নির্দেশ করলেও তা-ই প্রকৃতপক্ষে সত্য। খোদার কালামে যা মিথ্যা বলে প্রকাশিত তা মিথ্যা।

যদি কেউ কুরআন সম্বন্ধে এ ধারণা পোষণ করে, এর ঐতিহাসিক বিবরণী ও উপাখ্যানসমূহ ইঞ্জিল হতে সংগ্রহ করা হয়েছে, তবে এটা তার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক মূর্খতা হবে। পবিত্র ও স্বর্গীয় গ্রন্থে কি কোন পুরাকালীন বিবরণী সন্নিবেশিত থাকতে পারে না? দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন হিন্দুদের বেদগ্রন্থেরও (যা কুরআন অবতীর্ণ হবার যুগে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত গ্রন্থ ছিল) কোন কোন সত্য বাণী কুরআনে দেখতে পাওয়া যায়। তবে কি আমরা মনে করতে পারি, হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বেদও পাঠ করেছিলেন? মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে বাইবেল এখন সুলভ ও সুপরিচিত হলেও, পুরাকালীন আরবগণ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। তারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর জাতি ছিল, যদিও তাদের দেশে কখনও কোন খ্রীষ্টান বাস করতো তবে তারও স্বধর্মের বিস্তারিত জ্ঞান ছিল না (২) সুতরাং এ অপবাদ যে, হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ সকল পুস্তক হতে অপহরণ করে এ বিবরণীসমূহ কুরআন শরীফে লিখিয়ে ছিলেন, এক মহা অভিশাপজনক অপবাদ! হযরত সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষার জ্ঞান তো দূরের কথা, মাতৃভাষা আরবীও তিনি পড়তে জানতেন না।

টীকা ঃ (১) খ্রীষ্টানধর্মমতে . স্বধর্মের সহায়কল্পে সর্বপ্রকার অপবাদ ও মিথ্যাকথা অনুমোদিত ও পুণ্যকর্ম বলে উল্লেখিত (পলের বাক্য দ্রষ্টব্য)।

(২) পাদরী ফিন্ডেল সাহেব তাঁর লেখা 'মীযানুল হক' এ স্বীকার করেছেন, আরবের খৃষ্টানগণ পশুর ন্যায় ও সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলো।

আল্লাহ্‌র নূর সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২ আগস্ট, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহার পর সূরা যুমার-এর ৭০ আয়াত পড়ে হুযূর খুতবা দেন (সূরাতুয্ যুমার ঃ ৭০)।

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ এবং পৃথিবী তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং কিতাব সম্মুখে রেখে দেয়া হবে এবং নবীগণকে এবং সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং তাদের সকলের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে সুবিচার করা হবে আর তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ পৃথিবীর সৃষ্টিসমূহকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার উপর নিজ নূর ঢেলেছেন। যার উপর তাঁর নূর পড়েছে সে হেদায়াত পেয়েছে। আর যার উপর ঐ নূর পড়ে নি সে বিপথগামী হয়েছে" (তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান)।

হযরত সুফিয়ান বিন আওফ বলেছেন, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছেন যে, তাঁরা আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে একদিন উপস্থিত ছিলেন যখন আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন, "গরীবের জন্য শুভসংবাদ আছে।" হুযূর (সঃ)-এর খেদমতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ঐ গরীবরা কারা? হুযূর (সঃ) বলেছিলেন, "মন্দ লোকদের মধ্যে যারা সৎ লোক, যাদের প্রতি মানুষ সাধারণতঃ আনুগত্যের তুলনায় অবাধ্যতাই বেশি প্রদর্শন করে।"

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেছেন, 'আমরা অন্য একদিন আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট একত্র হয়েছিলাম তখন ছিল সকাল বেলা। আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন, "কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের লোকেরা আসবে তাদের নূর সূর্যের আলোর মত উজ্জ্বল ঝকঝক করবে। আমরা বলেছিলাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার এ উম্মতীরা কারা?' হুযূর (সঃ) বলছিলেন, 'মুহাজেরদের মধ্যে গরীবরা, যাদের কারণে (সকলকে) বহু অপ্রিয় ধ্বংসলীলা হতে রক্ষা করা হয়। তাদের মধ্যে যখন কেউ মারা যায় তো তাদের অন্তরে অনেক অভাব এবং প্রয়োজন গোপন থেকে যায়। এদের সকলকে পৃথিবীর প্রান্তসমূহ থেকে একত্র করে আনা হবে" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)।

আল্লামা আবূ আব্দুল্লাহ্ কুরতবী "ওয়া আশরা-কাতিল আরযো বিনূরি রব্বিহা" (আলোচ্য আয়াত) এর তফসীরে লিখেছেন, পৃথিবীর ইশরাকের অর্থ, পৃথিবীর আলোকিত হওয়া; যেমন বলা হয়, "সূর্যের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পেয়েছে" অর্থাৎ সকাল বেলা সূর্য উদয় হবার সময় যে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়। আশরাকাতিশ্ শামস্ অর্থ সূর্য উদিত হয়েছে।

যাহাক বলেছেন, "বিনূরি রব্বিহা" অর্থ বেহুকমি রব্বিহা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশে। একই পৃথিবীর আলোকিত হয়ে যাওয়া। বলেছেন, পৃথিবী আলোকিত হয়েছে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচারের ফলে, নিজ বান্দাদের প্রতি সঠিক বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রদানের ফলে। যুল্‌ম (অন্ধকার) অর্থ অন্ধকার। ন্যায় বিচারই নূর। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন একটি নূর সৃষ্টি করবেন যদ্বারা তিনি পৃথিবীকে ঢেকে দিবেন যার ফলে পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠবে। ইবনে এবাদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত নূর অর্থ সূর্য বা চাঁদের আলো নয় বরং ঐ নূর এমন নূর যা বিশেষভাবে তখন সৃষ্টি করা হবে এবং এর দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে।"

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী (রহঃ) লিখেছেন, 'ওয়া আশরাকাতিল আরযো বিনূরি রব্বিহার' নূরের অর্থ কেবল (আদ্‌ল) ন্যায়-বিচার। কারণ বলা হয়েছে যে, নবী ও শহীদগণকে সাক্ষীস্বরূপ পেশ করা হবে। এর অর্থই ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা। অনুরূপভাবে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে "তাদের প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হবে না।" এর থেকেও এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এখানে নূর অর্থ ন্যায়-বিচার এবং অত্যাচার দূরীকরণ।"

আল্লামা আলুসী লিখেছেন, "ওয়া আশরাকাতিল আরযো বিনূরি রব্বিহা'-এর নূরের অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) যেমন বলেছেন যে, এখানে নূর অর্থ আল্লাহ্ কোমল চন্দ্র-সূর্যের নূরের কথা বলেন নি বরং এখানে আধ্যাত্মিক নূরের কথা বলা হয়েছে।"

হযরত হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দী এখানে নূর অর্থ 'ন্যায়-বিচার' করেছেন। কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতে 'নূর' শব্দ ন্যায়-বিচার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন এবং বুরহান (দলিল)-কেও নূর বলা হয়েছে। সুতরাং পৃথিবী আল্লাহ্‌র নূরে উদ্ভাসিত হবে অর্থ সেখানে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্‌র নেযাম (ব্যবস্থাপনা) ন্যায়-বিচার ভিত্তিক পাপ পুণ্যের বিচার হবে।

আলোচ্য আয়াতের অর্থে একথা আছে, চূড়ান্ত বিচার / মীমাংসার সময় আল্লাহ্ উপস্থিত হবেন। এর জন্য উল্লেখ আছে, "ইয়াতিয়াহু-মুল্লাহু ওয়াল মালায়েকাতু ফী যুলালীম্ মিনাল গামামে" (রূহুল মানী)।

তফসীর কুম্মীতে হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'এখানে রব্বুল আরয'-অর্থ ইমামুল আরয (পৃথিবীর ইমাম)। তারপর বলা হয়েছে যে, হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) বলেছেন, "যখন তিনি (ঐ ইমাম) আবির্ভূত হবেন তখন মানুষ চন্দ্র-সূর্যের আলোর অভাববোধ করবে না বরং তাঁর (আঃ) নূরই যথেষ্ট হবে।"

"এরশাদুল মুফিদ"-গ্রন্থে হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, "আমাদের প্রিয় নেতা হযরত ইমাম কায়েম ইমাম মাহ্দী (আঃ) আবির্ভূত হবেন তখন পৃথিবী আল্লাহ্‌র নূরে আলোকিত হয়ে যাবে। মানুষ সূর্যের আলো বা চাঁদের আলোর অভাববোধ করবে না সমস্ত অন্ধকার দুরীভূত হয়ে যাবে" (তফসীর সাফী)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, (কবিতার অনুবাদ)

"ফুলসমূহকে গিয়ে দেখ, তো সেখানে তারা তাঁরই কারণে উপস্থিত আছে। তাঁরই নূর চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে ঝক্ ঝক্ করছে।

সমস্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁরই নূর।

সুন্দর কী জিনিস? সেই নূরই পর্দার আড়ালে উজ্জ্বলতা প্রদান করছে।

প্রত্যেক চোখ যে সুন্দরের সৌন্দর্যে বিভোর সে ঐ নূরকেই দেখে।

প্রত্যেক হৃদয় তারই রূপে মুগ্ধ

(দূর্‌রে সামীন)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"এটি আল্লাহ্‌র সুন্নত (বিধান) যে, তিনি যা কিছু করেন সব কিছুর জন্যই কিছু জাগতিক উপকরণের ব্যবহার করেন। জাগতিক উপকরণ ব্যতীত করেন । হ্যাঁ, একথা আলাদা যে, সে উপকরণ আমরা দেখি বা না দেখি। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উপকরণ অবশ্যই থাকে। অনুরূপভাবে আকাশ থেকে নূর অবতীর্ণ হয় এবং পৃথিবীতে এসে তা উপকরণ সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ দেখলেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগে পৃথিবীকে অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং চারিদিকে তখন গুমরাহী (হেদায়াত শূন্যতা) ও অন্ধকার খুব ঘন হয়ে বিস্তার লাভ করেছিল তখন সেই অন্ধকার এবং গুমরাহীকে দূর করে সেখানে শুভ ও মঙ্গলকে প্রবর্তন করার জন্য একজন সিরাজে মুনীর ফারান পাহাড়ের চূড়ায় উদ্ভাসিত হোল, অর্থাৎ আঁ হযরত (সঃ) আবির্ভূত হলেন।" (মলফূযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১)

হযরত (আঃ) আয়েনায়ে কামালতে ইসলামে আরো লিখিছেন,

"সেই সর্বোচ্চ স্তরের জ্যোতিঃ যাহা মানবকে অর্থাৎ পূর্ণ মানবকে দেওয়া হইয়াছে তাহা ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না, সূর্যে ছিল না, তাহা পৃথিবীর সমুদ্র এবং নদীসমূহে ছিল না, তাহা মুক্তা, মাণিক, পান্না, মতিতেও ছিল না। বস্তুতঃ তাহা পৃথিবী ও আকাশের কোন বস্তুতেই ছিল না, কেবল মাত্র মানবের মধ্যে ছিল অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মধ্যে। তিনি হইলেন শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণতম, সর্বোত্তম ও সুন্দরতম অস্তিত্ব আমাদের নেতা ও প্রভু-নবীগণের নেতা, অমর জীবন প্রাপ্তগণের নেতা মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

অতএব এই জ্যোতিঃ পূর্ণ মানবকে দান করা হয়েছে, এবং মর্যাদানুসারে তাহাদিগকেও কিছু দান করা হইয়াছে যাহারা তাঁহারই মতন কিছু গুণ রাখিত- এই মর্যাদা, উচ্চতা ও পূর্ণতাসহ এবং পূর্ণাঙ্গীণভাবে কেবলমাত্র আমাদের নেতা ও প্রভু-আমাদের হাদী, নবী, উম্মী "সাদেক" ও "মসদুক" মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর মধ্যেই পুঞ্জীভূত" (রূহানী খাযায়েন ৫ম খন্ড; ১৬০ পৃষ্ঠা)।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর ইলহাম ঃ "আশরাকাতিল আরযো বিনূরি রব্বিহা পৃথিবী নিজ প্রভু-প্রতিপালকের নূরে ঝলমল করে উঠেছে" (তাযকিরাহ্ পৃঃ ৮০৫)।

১৮৯১ইং সনে হযরত আকদস (আঃ)-এর একটি আরবী ইলহামের অনুবাদ ঃ "... ঐ খোদা যিনি রহমান, তিনি তাঁর সুলতান খলীফার পক্ষে নিম্ন প্রকার আদেশ প্রদান করছেন যে, তাকে এক বিরাট রাজত্ব প্রদান করা হবে, এবং তার হাত দিয়ে জ্ঞানের ও ঐশী-তত্ত্ব জ্ঞানের- ভান্ডার উন্মুক্ত করা হবে এবং পৃথিবী নিজ প্রভু-প্রতিপালকের নূরে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এটা আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ যা তোমাদের চোখে আশ্চর্যের বিষয়" (ইযালায়ে আওহাম-পৃষ্ঠা ৮৫৭)।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন-৩০শে আগস্ট ২০০২ইং)

অনুবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

পর্ব ২ ঃ
অধ্যায় ঃ ১

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

হিন্দু মতবাদ

সে যাকগে। কখন থেকে কীভাবে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হিন্দু দর্শন অথবা বেদের শিক্ষা সবকিছুই আধুনিক বিজ্ঞানের সরাসরি বিপরীত ধর্মী। বিজ্ঞানের বির্বতন-তত্ত্ব বা আদিতে সাধারণ এক কোষী প্রাণীর উদ্ভবের কথা হিন্দু শাস্ত্র স্বীকার করে না। প্রফেসর জে. ভর্মন তার The Vedas পুস্তকে বেদের ব্যাখ্যা, হিন্দু দর্শন ও বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ করেছেন। তার মতে, সৃষ্টির আদি পর্ব বরং বর্তমানের চেয়ে বেশি উন্নত ছিল। বেদের ঋষিরা ছিলেন একদিকে কবি, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন (visionaries), আধ্যাত্মিক ব্যক্তি (spiritualists), অনেকটা একের ভিতরে তিনের সমন্বয়। তাদের ছাত্ররাও ছিলেন ঋষি, তারা শোনা মাত্র বিভিন্ন মন্ত্রের (mantras) তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারতেন। তাদের পরেই বরং মানুষের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা-চেতনার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। আর সৃষ্টির আদিতেই ব্রহ্ম ঋষিদের নিকট বেদের বাণী অবতীর্ণ করেছিলেন, যার ভিত্তিতে মানব জীবনের বিভিন্ন আইন-কানুন তৈরী হয়েছিল। তাই বিবর্তন-তত্ত্বের মাধ্যমে নয়, সরাসরি মানুষের আবির্ভাবের মাধ্যমেই এ পৃথিবীতে জীবনের শুরু হয়েছিল। অগ্নি, বায়ু, সূর্য এবং অঙ্গার (Angira) নামের এ ৪ ঋষি পৃথিবীর ছাদে বসে আছেন (sitting on the roof of the world)। তারা সবাই উচ্চতম বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা এবং দিব্য-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ধ্যানমগ্ন হয়ে তারা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী মানুষের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তি আদিপুরুষদের তুলনায় খুবই নিম্নমানের বলে অবলোকন করেন। তাদের পবিত্র অবস্থানস্থলের কিছু বর্ণনাও ভর্মনের উক্ত পুস্তকে আমরা দেখতে পাই। যেমন, আধুনিক তিব্বতের ত্রিবিস্তপা (Trivishtapa) অঞ্চলের মানস সরোবর হ্রদ, যা হিমালয়ের উপর অবস্থিত, এবং যেখান থেকে গঙ্গা, সিন্ধু শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদীর উৎপত্তি হয়েছে, যার বরফ আচ্ছাদিত শিখরগুলো এক অনবদ্য সৌন্দর্যের আকর, সেই চিত্তাকর্ষক স্থানই হলো ঋষিদের অবস্থানস্থল। যা-ই হোক, এ স্থলেই প্রথম মানুষের আবির্ভাব ঘটে। আর জীবনের এ

ধারা বিবর্তনের মাধ্যমে নয়, বরং উত্তরাধিকার সূত্রে আদি পুরুষ থেকে অন্যের মাঝে স্থানান্তরিত হয়।

সামগ্রিকভাবে উক্ত ধারাটি মানব জীবনের সাধারণ একটি আলেখ্য হলেও পুনর্জন্মের ব্যাপারে কিন্তু কর্মের রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অর্থাৎ একজন মানুষ তার এ জীবনে পাপ কাজ করে যদি তার মানববৃত্তিগুলোকে ধ্বংস করে তাহলে পরজন্মে সে মানুষ হিসাবে জন্ম নিবার অধিকার হারিয়ে ফেলে। তখন সে হয়তো কোন মানবেতর জীব হিসাবে জন্ম নেয়। এটাই হলো হিন্দুদের কর্ম-নির্ভর জীবন প্রক্রিয়া। এ ব্যাপারে প্রফেসর ভর্মনের উক্তি খুবই স্পষ্ট। তিনি একে খারাপ কাজের প্রতিফল ও শাস্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন- 'This is the fruit of action, this is the punishment of bad action'।

আমাদের বিশ্বাস বেদের শিক্ষার সাথে পুনর্জন্মের কথাকে সম্পৃক্ত করে হিন্দুরা বরং বেদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে। পুনর্জন্মের এ ব্যাখ্যাকে যদি আমরা চূড়ান্তভাবে মেনে নিই, তাহলে এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক বিষয়, বিশেষ করে জীবনের উদ্ভব সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যকে আবার নূতন করে বর্ণনা করতে হবে। এর ফলে বাঁচার জন্য সংগ্রাম (struggle for existence), যোগ্যতমের বেঁচে থাকার সুবিধা (survival of the fittest), এবং বংশগতিতে আকস্মিক পরিবর্তন (genetic mutations) - জনিত বিভিন্ন তত্ত্ব যা বিবর্তনবাদীরা এতদিন জোরে-শোরে বলেছেন তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। জীবের উৎপত্তির সমর্থনে তখন কর্ম ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকবে না।

আর এ কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনের বিকাশকে যদি বিশ্লেষণ করতে হয়, তাহলে সৃষ্টি হবে নানা জটিলতার। যেমন পৃথিবী যেহেতু পূর্বের তুলনায় বিভিন্ন পাপ ও অনৈতিক কাজে দিন দিন অগ্রসর হয়ে চলেছে, তাই মানুষের এ কর্মের প্রতিফল হিসাবে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্ম হওয়ার কথা বিভিন্ন মানবেতর প্রাণী হিসাবে। পঙ্গপালের মত বিভিন্ন প্রাণী, কীট-পতঙ্গ, এমনকি ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, কৃমি তখন ছড়িয়ে পড়বে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে। মানুষের বসবাসের জন্য জায়গা পাওয়াই হবে মুস্কিল। এমনও হতে পারে জায়গার অভাবে ভবিষ্যতের কোন মানুষের অন্ত্রের মধ্যেও অসংখ্য কৃমি জাতীয় মানুষের জন্ম হবে। মানুষের এসব অযোগ্য উত্তরাধিকারীর হাতেই তখন তারা কষ্ট পেতে থাকবে। প্রফেসর ভর্মনের দাবী অনুযায়ী এ রকম হওয়ায় কথা থাকলেও আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি, বেদে উল্লেখিত সে যুগের পরবর্তী সময়ে মানুষ ক্রমাগতই বর্ধিত পরিমাণে পাপ কাজ করে যাচ্ছে, অথচ তাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম কীট পতঙ্গ না হয়ে মানুষ হয়েই জন্ম গ্রহণ করছে।

শুধু উপরোক্ত বৈপরীত্যই নয়, নানা মহলে পুনর্জন্মের বিষয়টি নিয়ে দেখা দিবে নানা বিতর্ক। যেমন আদি যুগের সেই ৪ ঋষি, অথবা তাদের সম-সাময়িক ঋষিতুল্য ব্যক্তিরা ছিলেন সবাই পূত-পবিত্র। তাহলে তাদের পরে মানবেতর জীব হিসাবে জন্ম গ্রহণের প্রশ্ন কী ভাবে আসে? কর্মতো আমাদের এ নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, যতক্ষণ কর্ম ভাল থাকবে, ততক্ষণ জন্মও ভাল হবে। মানবেতর জীব হিসাবে মানুষের পুনর্জন্মের কথা আসতে পারে শুধু তখনই, যখন তাদের পাপ কাজের শাস্তি বা প্রতিফল হিসাবে ঈশ্বর তা করতে বাধ্য হবেন।

প্রফেসর ভর্মন অবশ্যই এর উত্তরে বলবেন, পুনর্জন্মের সূচনাটা পূত-পবিত্র ঋষিদের অনেক যুগ পরে ঘটেছিল যখন তাদের উত্তরসূরীরা পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা তার নিকট জানতে চাই, এ জাতীয় অবক্ষয়ী জনগোষ্ঠীর প্রারম্ভিক জনসংখ্যা কত ছিল? যুক্তির খাতিরেই ধরে নিতে হচ্ছে যে, সে সংখ্যা বর্তমান মোট মানবগোষ্ঠীর থেকেও কয়েক শ' কোটি গুণ বেশি ছিল। এজন্যে যে, বর্তমানে জীব জগতের বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যা কয়েক হাজার কোটি ট্রিলিয়ন (trillion) (১০ এর পরে ১৮টি শূন্য বসালে যে সংখ্যা হয়, তাকে ১ ট্রিলিয়ন বলে)। সে ক্ষেত্রে বর্তমান পৃথিবীর যে আয়তন তাকে তখন কয়েকশ' কোটি গুণ বড় হওয়ার কথা। কেননা, তা না হলে এত সব জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতিকে (যা পাপী হওয়ার কারণেই এখন এরূপে আছে, একদিন তো তারা মানুষ হিসাবেই পৃথিবীতে বিরাজ করতো। বর্তমান আকৃতির পৃথিবীর বুকে ধারণ করা তো সম্ভবপর ছিল না।

আরেকটি কথা, বেদের শিক্ষানুযায়ী ৪ জন ঋষি নিয়ে আদি পৃথিবীর সূচনা হয়েছিল যেই স্থানে অর্থাৎ তিব্বতে-বিজ্ঞানীদের মতে তার আবির্ভাব হয়েছিল জীবন সৃষ্টির অনেক পরে। বিজ্ঞানীদের গণনানুযায়ী আজ থেকে আনুমানিক ১শ' কোটি বছর (a billion years) আগে বর্তমান তিব্বত অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছিল, যখন মহাদেশীয় ফাঁটল ও বিস্ফোরণের ফলে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভারতের এ এলাকা আলাদা হয়ে যায়। ভূ-বিদ্যা বিশারদের (geologist) এ গণনা অস্বীকার করার অধিকার অবশ্য প্রফেসর ভর্মনের রয়েছে।

তবে এ পর্যায়ে তিব্বতের সে সময়কার আয়তনকে আপনাদেরকে আবার একটু খেয়াল রাখতে বলি। আদি পুরুষ ৪ জন ঋষি থেকে পরবর্তীতে যে সব মানবেতর প্রাণী ও কীটপতঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের পাপী পূর্ব-পুরুষরা কিন্তু সে অঞ্চলে আনুপাতিক হারে তখন বিদ্যমান থাকার কথা। সে প্রেক্ষাপটে আমরা তিব্বতের উপর সেই সময়কার শত কোটি মানুষকে একটু কল্পনার চোখে উপলব্ধি করার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি। কী দেখতে পাচ্ছেন? কেবল মানুষ আর মানুষ কিলবিল করছে। কেঁচো বা পোকার পাহাড়ের মত সারা তিব্বত জুড়ে শুধু মানুষের ঢেউ। মানুষ ছাড়া আর কিছু নেই, এমনকি এক মুঠো খাবারও নেই (humans everywhere, and not a morset to eat)।

আমরা যদি তত্ত্বমূলক দিক থেকে কর্ম নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান পৃথিবীতে বিরাজমান সকল জীব তাদের বর্তমান উপস্থিতির মাধ্যমে পূর্বজন্মের দায় বা দায়িত্ব বহন করে চলেছে। আর অনন্ত কাল পর্যন্ত এ ধারা চলতেই থাকবে। কেননা পরমেশ্বর খুবই ন্যায়-পরায়ণ এবং আত্মা এবং বস্তু যেরূপ নিরপেক্ষ, কারো প্রতিই তেমনি তিনিও কোন পক্ষপাতিত্ব করেন না। এ নীতি অনুসারে পুনর্জন্মের চক্রে মানুষের কর্মের অনুরূপ প্রতিফল অর্থাৎ, পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদান করা ছাড়া তাই ঈশ্বরের আর কিছু করার ক্ষমতা নেই। অন্যান্য বড় বড় ধর্মগুলোতে কিন্তু খোদার শক্তির প্রকাশ ভিন্নতর। তিনি সৃষ্টির জন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভরশীল নন, এবং যখন যা চান তা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি সকল জীবের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ প্রয়োজন মিটাবার উপকরণ সৃষ্টি করে চলেছেন। তাই কোন ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র এমিবা (amoeba) যেমন তার তুচ্ছ উপস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট, তেমনি একজন রাজাধিরাজ সম্রাটও তার গৌরবময় সিংহাসনে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। প্রত্যেকেই তার স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন। কিন্তু হিন্দু বিশ্বাস মতে তাদের পরমেশ্বরেরও পুনর্জন্মের কাঠামোর বাইরে কোন স্বাধীনতা নেই (চলবে)।

অনুবাদ - **অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন**

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(৩০-০৪-০২ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত)

(মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করেন)

প্রশ্ন নং ১ ঃ পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৮৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত কষ্টকর দায়িত্ব ন্যস্ত করেন না"। কারও কারও জীবনে এতই বড় সমস্যা দেখা দেয় যে, অনেকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। দয়া করে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা সত্যি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কার্যক্ষমতা থাকে। এ শক্তি ও সামর্থ্যের ভিত্তিতেই মানুষ কাজ করে থাকে। শাস্তি ও কষ্টের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের কৃতকর্মের জন্যেই আল্লাহ্ শাস্তি বা কষ্ট দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন নং ২ ঃ আল্লাহ্তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ "এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করিবে তাহারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হইবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করিয়াছেন অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং সালেহগণের মধ্যে। এবং ইহারাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম"। অনেকে এর অন্য রকম ব্যাখ্যা করে থাকেন। এর আসল ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ তারা কীভাবে ব্যাখ্যা করে? মোল্লা সাহেব বল্লেন, আল্লাহ্ ও এ রসূল (মুহাম্মদ) সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করলে এখানে উল্লেখিত নেয়ামতসমূহ লাভ করা সম্ভব নয়।

হুযূর (আইঃ) বলেন, এখানে যে 'নাবীঈন' শব্দ আছে যা আল্লাহ্তাআলা রসূলে করীম (সঃ)-এর আনুগত্যের সাথে বেঁধে দিয়েছেন তারা তা এড়াতে চায়। তারা বলে, নবী করীম (সঃ)-এর আনুগত্য করলে নবীদের সাথে থাকবে, সিদ্দীকদের সাথে থাকবে, শহীদদের সাথে থাকবে এবং সালেহদের সাথে থাকবে, কিন্তু তাদের মত হবে না কেবল সাথে থাকবে। এ অর্থ একেবারে ভুল। 'মাআ' শব্দের অর্থ সাথী হয় এবং অন্তর্ভুক্তও হয়। কুনূ মাআস্ সদেকীন আয়াতে 'মাআ' শব্দটি দ্বারা কি এ অর্থ হবে যে, তোমার পবিত্র লোকদের সাথী হও কিন্তু পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আরবী ভাষার ব্যবহার অনুযায়ী 'মাআ' শব্দটি 'মিন' অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একজন। যখন নেক লোকদের সাথী হও তখন চূড়ান্ত লক্ষ্য কী? কেবল সাথে সাথে থাকা না কি নেক লোক হওয়াও বুঝায়? পুণ্যবানই যদি না হয় সত্যবাদী যদি না হয় তাহলে সাথে থাকার উদ্দেশ্য কী? তারা বলেন, হুযূর (সঃ)-এর আনুগত্যের ফলে কিছুই হওয়া যায় না। তাহলে আনুগত্যের ফল কী হলো? এ অর্থ ঠিক হতে পারে না। রসূলে করীম (সঃ)-এর আনুগত্য করার অর্থই হলো কোন এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যদি মানুষ কমপক্ষে পুণ্যবানও না হতে পারে তাহলে তাঁকে (সঃ) অনুসরণ করায় লাভ কী?

প্রশ্ন নং ৩ ঃ ১৯৭৪ সনে পাকিস্তান সরকার আমাদেরকে নন-মুসলিম ঘোষণা করে। সেই সময় পার্লামেন্টে এ বিষয়ে ২ সপ্তাহব্যাপী যে আলোচনা হয়েছিলো সেখানে আপনিও ছিলেন। তখনকার সময়ের প্রেক্ষিতে আপনি যদি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করেন তাহলে খুশী হবো।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, আমি তখন সংসদে উপস্থিত ছিলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)-এর উত্তরে প্রকৃতপক্ষে পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য ও অন্যান্যরা এমনি প্রভাবান্বিত হন যে, আশ্চর্য হতে হয়। তারা মৌলভীদেরকে অভিশাপ ও ধিক্কার দিতে থাকেন আর বলতে থাকেন যে, কোনক্রমেই আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করা যায় না। কিন্তু এসব বিবরণ কখনও পুস্তকাদিতে বা সংসদের কার্যক্রমে প্রকাশ করা হয় নি। সাংসদরা হুযূর (রাহেঃ)-কে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। এমন কি ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন সাংসদ আমাকেও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আর বলেছেন, যে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছে তা এখন আর কার্যকরী হবে না। কিন্তু পরে ভুট্টো তার রাজনৈতিক স্বার্থকে উদ্ধার করার জন্যে আমাদেরকে 'বলির পাঠা' বানিয়েছেন। সে তার পরিণামও দেখেছে। ভুট্টো পার্লামেন্টের সদস্যদের বলেন, যদি তোমরা এ সিদ্ধান্ত না নাও তাহলে 'মোল্লা রূপী কুকুর'দের সম্বন্ধে সাবধান হও। তোমরা গুন্ডা কর্তৃক শাস্তি পাবে। অথচ বৃহত্তর সংখ্যক সাংসদ আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করার বিপক্ষে ছিল।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ্তাআলা খিলাফত দিয়েছেন। তিনি কি খেলাফতের কারণে জান্নাতে গিয়েছিলেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আসলে হযরত আদম (আঃ) তো তাঁর মৃত্যুর পরেই জান্নাতে প্রবেশ করেছিলেন। জীবিত অবস্থায় যে জান্নাতে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ সে জান্নাতে তিনি প্রবেশ করেন নি। মোল্লারা এর ভুল অর্থ করেন। আদম নাকি জান্নাতে ছিলেন আর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে তিনি সেখান থেকে বহিষ্কৃত হন। এটি কুরআনের আয়াতের সঠিক অর্থ নয়। আর পৃথিবীর যে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে তাহলো মানুষের পরস্পর প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার জান্নাত। শরীয়তের যে চার দেয়াল একে জান্নাত বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ জান্নাতে তোমরা বসবাস কর। কিন্তু পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ করে শরীয়তরূপী ও পরস্পর প্রেম-প্রীতির জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। আর আদম যে কষ্ট পেয়েছেন তা মানুষের কারণে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে সেরকম থাকতে দেন নি। কুরআনে আছে যে, এমন কলেমা তিনি তাকে শিখিয়েছেন যাতে তিনি নাজাত পেয়েছেন ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টিভাজন হয়েছেন। রসূলে করীম (সঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্তাআলা বলেন, শয়তান যেন তোমাকে সেই জান্নাত থেকে বহিষ্কার না করে যে জান্নাত থেকে তোমার পূর্ব-পুরুষেরা বহিষ্কৃত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে আদম ও তার সময়কার লোকদের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা সঠিক। হুযূর (সঃ) তো জীবনে কখনও জান্নাতে সেভাবে প্রবেশ করেন নি বা কোন আকাশেও তিনি যান নি। এখানে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, জান্নাত অর্থ শরীয়তের চতুর্সীমা। চতুর্সীমার মাঝে যারা থাকবে তাদেরকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এথেকে যারা বেড়িয়ে যাবে তারা জান্নাতের বাইরে থাকবে।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ তবলীগ করতে গিয়ে আমরা নিজ চরিত্র ও দোয়াকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এ ছাড়াও আর কী কী বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে বলে আপনি মনে করেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ সফল মুবাল্লিগ হওয়ার উত্তম পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনি বলে দিয়েছেন। প্রথমতঃ

ব্যক্তিগত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। কারও ব্যক্তিগত চরিত্র যদি ভাল হয় তাহলে সবাই তার কথা শুনতে বাধ্য হবে। কুরআন করীমে এর প্রমাণ রয়েছে- **ওয়া মান আহসানু কৃওলাম্ মিম্মা দাঈ ইলাল্লাহ্** - সেই ব্যক্তির তুলনায় উত্তম কথা কার হতে পারে যে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং নিজে সৎকর্ম করে। সুতরাং কারও ব্যক্তিগত চরিত্র যদি ভাল হয় তাহলে মানুষ তার দিকে আকৃষ্ট হবেই।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ কুরআন রসূলুল্লাহ্‌র ভাষায় বলেছে- আমি কৃত্রিমতার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। সে সময় আরব সমাজে কী কী কৃত্রিমতা ছিলো?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ রসূলে করীম (সঃ) যে সমাজে প্রেরিত হয়েছেন সে সমাজে মুনাফিকই ছিলো বেশি। তারা বাইরে করতো একটা আর তাদের ভিতর ছিলো অন্য রকম। রসূলে করীম (সঃ)-এর সামনে যখন তারা আসতো তখন তারা এক ধরনের আচরণ দেখাতো এবং পরে তারা অন্য রকম আচরণ দেখাতো। রসূলে করীম (সঃ)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিলো এক রকম। জীবনের দু'ধরনের আচরণ তাঁর মধ্যে কখনও প্রকাশ পায় নি। তাঁকে উপরোক্ত কথা বলার জন্যে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন- আমার মধ্যে দ্বিমুখী কথা দেখতে পারবে না। তিনি (সঃ) সর্বদা সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সবসময় সত্যের দিকে তিনি ডাকতেন।

(এ পর্যায়ে তারেক সাহেব 'ওহ্ পেশওয়া হামারা' নামের একটি নযমের কয়েকটি পংক্তি পাঠ করেছেন)।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রাশিয়াতে বালু কণার মত আহমদীরা প্রসারিত হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তা কীভাবে সম্ভব হবে, হুযূর (আইঃ) একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ যতক্ষণ পর্যন্ত এ জাতির অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সম্ভব হবে না। তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ মি'রাজের রাত্রে হুযূর (সঃ)-কে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। এ মসজিদ আকসা কোন্‌টি।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ মসজিদে আকসা অর্থ দূরবর্তী মসজিদ। এতদ্দ্বারা আক্ষরিক অর্থে কোন মসজিদ বুঝায় নি। তখনতো মজসিদে আকসা ছিলোই না। সুতরাং মসজিদে আকসা দ্বারা অনেক দূরের কোন মসজিদকে বুঝাচ্ছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কল্যাণ লাভের খাতিরে কাদিয়ানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যার নাম মসজিদে আকসা। প্রতিকী বিষয় এটি। হযরত রসূলে করীম (সঃ) মসজিদুল হারাম থেকে সেই দূরবর্তী মসজিদে পৌছেছেন। পৃথিবীর কোন স্থানে এ রকম কোন মসজিদ ছিলো না। বরং দূরের কোন যুগের দিকে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ টিয়া পাখী বা ময়না পাখী মানুষের মত কথা বলতে পারে। এর পেছনে রহস্য কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আসলে কোন কোন পাখী এমন আছে যারা মানুষের কথাকে অনুসরণ করতে পারে। আল্লাহ্‌তাআলা কোন কোন পাখীকে নকল করার ক্ষমতা বা সামর্থ্য দিয়েছেন। বাংলাদেশের ময়না পাখী মানুষের মত কথা বলতে পারে। এটা হলো সৃষ্টির ভিতরে আল্লাহ্‌তাআলার আশ্চর্যজনক দিক। আল্লাহ্‌তাআলা এ পৃথিবীতে কত অদ্ভুত জীব সৃষ্টি করেছেন! এরা সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বলা হয়, এক ব্যক্তি তোতা বিক্রী করছিলো। সে যখন বিভিন্ন খরিদ্দারের সাথে কথা বলছিলো তখন তোতা সেসব কথা শুনতো আর সে কথাগুলো নকল করতো, অনুকরণ করতো। একবার মূল্য জিজ্ঞেস করা হলো, এ তোতার মূল্য কত? তোতা বললো, এক হাজার টাকা। এক ব্যক্তি তোতাকে কিনে ঘরে নিয়ে গেছে। ঘরে গিয়ে দেখা গেলো সে আর কথা বলে না। সে রাগান্বিত হয়ে দোকানে ফিরে আসলো এবং বললো, তোমার তোতা তো কথা বলে না। দোকানী বললো, আমি কি তাকে জিজ্ঞেস করবো সে কথা বলতে পারে কিনা? জিজ্ঞেস করলে তোতা বললো, হ্যাঁ কথা বলতে পারি। এগুলো তো কাহিনী।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ নামাযের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত কোন্‌টি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ কোন্ ভঙ্গীটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটি নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। রুকূ, সিজদা না ক্বদা। প্রত্যেকটিরই আলাদা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামী নামাযের বিভিন্ন ভঙ্গি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে উপাসনার যে পদ্ধতি রয়েছে তার প্রতিনিধিত্ব করছে। হিন্দুদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইবাদত করার পদ্ধতিটি আমাদের নামাযের একটা অংশ। তেমনিভাবে অন্য ধর্মে কারও প্রতি ঝুঁকে সম্মান দেখাবার রীতি আছে। ইসলামী নামাযে রুকূ বা ঝুঁকা এদিকে ইঙ্গিত করে। তেমনিভাবে হলো সিজদা-এটাও গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বযুগে মানুষ বড় বড় লোকদের সিজদা করতো। ইসলামী নামাযে এটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই কোন একটা বিশেষ ভঙ্গীকে গুরুত্বপূর্ণ বলাটা কঠিন। যদি আদৌ কোন একটা ভঙ্গীকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বেছে নিতে হয় তাহলে আমি সেজদাকে বেছে নিবো।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ সূরা আহযাবের ৭৩ আয়াতের ব্যাখ্যা শুনতে চাই।

উক্ত আয়াতের অর্থ হলো ঃ

"নিশ্চয় আমরা (শরীয়তের) আমানতকে আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং পর্বতমালার সমক্ষে উপস্থাপন করছিলাম কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং তাতে ভয় পেল। কিন্তু ইনসান তা বহন করলো। নিশ্চয় সে (নিজের প্রতি) যুলুমকারী (পরিণাম সম্বন্ধে) বেপরোয়া"।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এ আয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো "যলূমান জহুলা" অর্থাৎ যুলুমকারী ও বেপরোয়া এ দু'টো শব্দ হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর উন্নত ধরনের প্রশংসায় বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলে করীম (সঃ) ছিলেন 'যলূম' অর্থাৎ নিজের ওপর যুলুমকারী। নিজের ওপর অত্যাচার করতেন। নিজের প্রতি দয়া করেন নি। আল্লাহ্‌র খাতিরে তিনি সকল প্রকার বোঝা বহন করেছেন- সকল প্রকারের কষ্ট সহ্য করেছে। আর 'জহুল' শব্দ এসেছে জাহিল থেকে। অর্থ হলো পরিণাম সম্বন্ধে যে চিন্তা করে না। তিনি যে এত বড় বোঝা বা দায়িত্ব বহন করছেন। এর পরিণাম কি হতে পারে, কত কষ্টে তিনি পড়তে পারেন তা আদৌ কখনও ভাবেন নি। মানব জাতির কল্যাণার্থে পরিণাম সম্বন্ধে তিনি বেপরওয়া ছিলেন। তাঁর প্রশংসারূপ এ দু'টি শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ কুরআন বলে সামী'না ও আতা'না। এখানে সামীনা শব্দের অর্থ কি শুনা এবং বুঝা নাকি আক্ষরিক অর্থে শোনা ও আনুগত্য করা।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ উভয় কথাই সত্য। প্রধানতঃ কোন কিছু অর্থপূর্ণভাবে শুনা এবং পরে বুঝা, উপলব্ধি করা আর আনুগত্য করা।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ অন্যান্য ধর্মকে ইসলাম কীভাবে দেখে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ ইসলাম অন্যান্য ধর্মের প্রতি ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে আচরণ করে থাকে। আর কোন ধর্মকে ইসলাম হেয় বা তুচ্ছ মনে করে না বা করা উচিত নয়। যে ধর্মেরই হোক না কোন প্রত্যেক শিশু ফিতরতের ওপরে জন্ম নেয়। সঠিক ও সুস্থ ফিতরত নিয়ে জন্ম নেয়। এটা হলো ইসলামের ফিতরত। পরে পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বা খৃষ্টান বা পিতামাতা যে ধর্ম পালন করে তার অনুসারী করে নেয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য ধর্মের প্রতি ইসলামের আচরণ পক্ষপাতদুষ্ট নয়। ইসলাম এগুলোকে ন্যায়ের ভিত্তিতে দেখে থাকে।

সংকলন - নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(২৬তম কিস্তি)

রিযকের প্রাচুর্যের জন্যে দোয়া

♦ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সমীপে নিবেদন করেন, [হে আল্লাহ্‌র রসূলে (সঃ)] আজ রাত্রে আমি আপনার দোয়া শুনেছি আর যে শব্দগুলো আমি শুনতে পেয়েছি তা ছিলো এই। হুযূর (সঃ) বলেন, ভাল করে দেখো এ দোয়াতে কোন কমতি আছে কি? দোয়াটি এরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ ذَنْبِیْ وَوَسِّعْ لِیْ فِیْ دَارِیْ وَ بَارِكْ لِیْ فِیْمَا رَزَقْتَنِیْ۔ (ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মাগ ফিরলী যাম্বী ওয়া ওয়াস্‌সি' লী ফী দারী ওয়া বারিক লী ফিমা রযাক্বতানী - তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমার পাপ আমাকে ক্ষমা করে দাও আর আমার জন্যে আমার ঘরকে প্রসারিত করে দাও আর তুমি আমাকে যে রিয্‌কই দাও তা আমার জন্যে কল্যাণমণ্ডিত করো।

বৃদ্ধ বয়সে রিয্‌কের প্রাচুর্যের জন্যে দোয়া

♦ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَیَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّیْ وَ انْقِطَاعِ عُمُرِیْ۔ (مستدرک حاکم کتاب الدعاء جلد ا صفحہ ۵۴۲ بیروت)

(আল্লাহুম্মাজ'আল আওসা'আ রিয্‌ক্বিকা আলায়্যা কিবারি সিন্নী-ওয়ান ক্বিত্বাই উমুরী - মুস্তাদরাক হাকিম কিতাবুদ্ দোয়ায়ে, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৪২, বৈরুতে মুদ্রিত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমার বৃদ্ধ বয়সে ও শেষ বয়সে আমাকে তোমার রিয্‌কের প্রাচুর্য দান করো।

ফল ও শস্যাদির কল্যাণ লাভের দোয়া

♦ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ফল দেখে এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیْ ثِمَارِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِیْ مَدِیْنَتِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِیْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا۔ (ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফী ছিমারিনা ওয়া বারিকলানা ফী মাদীনাতিনা ওয়া বারিক লানা ফী সা'ইনা ওয়া মুদ্দিনা - তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের ফল-ফলাদিতে কল্যাণ দাও, আর আমাদের শহরে আমাদের জন্যে কল্যাণ দাও, আর আমাদের খাদ্য শস্যের (মুদ্দ ও সা'-এর) ওজনেও আমাদের জন্যে কল্যাণ দাও।

সৎকর্ম করার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সৌভাগ্যের দোয়া

♦ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম থেকে এমন দোয়া শিখেছি যা আমি কখনও পড়তে ভুলি না। তা এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ اُعْظِمُ شُكْرَكَ ،وَ اُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَ اَتَّبِعُ نُصْحَكَ ،وَاَحْفَظُ وَصِیَّتَكَ۔ (مسند احمد مطبوعہ بیروت جلد ۲ صفحہ ۳۱۱)

(আল্লাহুম্মাজ'আলনী উ'যিমু শুকরাকা-ওয়া উকসিরু যিক্‌রকা ওয়া আত্তবি'উ নুসহাকা ওয়া আহফিযু ওয়াসিয়্যাতাকা - (মুসনাদ আহমদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১১, বৈরুতে মুদ্রিত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে এমন বানিয়ে দাও যেন তোমার অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি। আর তোমাকে বেশি বেশি স্মরণ করি আর তোমার মঙ্গলের কথা অনুসরণ করি আর তোমার কড়াকড়ি আদেশের সুরক্ষা অর্থাৎ আমল করতে পারি।

একটি পরিপূর্ণ দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এমন একটি দোয়া বর্ণনা করেন ঃ

رَبِّ اَعِنِّیْ ،وَلَا تُعِنْ عَلَیَّ ،وَانْصُرْنِیْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَیَّ ،وَامْكُرْ لِیْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَیَّ ،وَاهْدِنِیْ وَ یَسِّرِ الْهُدٰی لِیْ ،وَانْصُرْ عَلٰی مَنْ بَغٰی عَلَیَّ ،رَبِّ اجْعَلْنِیْ لَكَ شَاكِرًا ،لَكَ ذَاكِرًا ،لَكَ رَاهِبًا ،لَكَ مِطْوَاعًا ،لَكَ مُخْبِتًا ،اِلَیْكَ اَوَّاهًا مُنِیْبًا ،رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِیْ ،وَاغْسِلْ حَوْبَتِیْ ،وَاَجِبْ دَعْوَتِیْ ،وَثَبِّتْ حُجَّتِیْ وَسَدِّدْ لِسَانِیْ وَاهْدِ قَلْبِیْ ،وَاسْلُلْ سَخِیْمَةَ صَدْرِیْ۔ (ترمذی کتاب الدعوات)

(রব্বি আ'ইন্নী 'ওয়ালা তুইন আলায়্যা - ওয়ানসুরনী-ওয়া লা তানসুর আলায়্যা-ওয়ামকুরলী ওয়ালা তামকুর আলায়্যা ওয়াহ্‌দিনী ওয়া ইয়াস্‌সিরিল হুদালী - ওয়ানসুর 'আলা মান বাগা আলায়্যা রব্বিজ আলনী লাকা সাকিরান-লাকা যাকিরান লাকা রাহিবান-লাকা মিত্বওয়া 'আন-লাকা মুখবিতান ইলায়কা আওওয়াহান মুনীবান-রব্বি তাক্বাব্বাল তাওবাতি-ওয়াগসিল হূবাতী ওয়া আজিব দা'ওয়াতি-ওয়া ছাব্বিত হুজ্জাতা ওয়া সাদ্দিদ লিসানী-ওয়াহ্‌দি-ক্বলবী ওয়াসলুল সাখীমাতা সদরী (তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করো আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করো না, আমাকে সাহায্য করো আমার বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করো না। আমার জন্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থা করো। আমার বিরুদ্ধে চেষ্টা-প্রচেষ্টা কোর না। আমাকে হেদায়াতের প্রতি প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং আমার জন্যে হেদায়াতের পথ সহজ করে দাও। যে ব্যক্তি আমার ওপরে বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো। আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে তোমার কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, তোমার যিক্‌র (স্মরণ)-কারী, তোমাকে ভয়কারী, তোমার পূর্ণ আনুগত্যকারী, তোমার সমীপে বিনয়ী বানাও। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার তওবা গ্রহণ করো, আমার পাপ ধুয়ে-মুছে দাও, আমার দোয়া কবুল করো, আমার দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে দাও, আমার কথা সরল-সুদৃঢ় করে দাও, আমার অন্তরে হেদায়াতের সৌভাগ্য দাও, আর আমার বক্ষ থেকে সংকীর্ণতা বের করে দূরে নিক্ষেপ করে দাও। (চলবে)

অনুবাদ- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

স্মৃতি কণা

ছোট কিন্তু প্রাণবন্ত
'তুইও কাইদ্দানি হবে'

❑ ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় আমি পুনিআউট (পূণ্যট) গ্রামে শ্রদ্ধেয় জনাব তুতুমিয়ার বাড়িতে জায়গীর ছিলাম। ঐ সময়ে জনাব আবদুর রহমান খাঁ আহমদী হন। পরবর্তীতে তিনি আমেরিকায় অবস্থিত মিশনারী ইনচার্জ নিযুক্ত হন। আহমদী হওয়ার আগেই তিনি তারুয়াতে বিয়ে করেন। তিনি খুবই মিষ্টি-স্বভাব ও ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন। আহমদী হওয়ার কারণে তাকে আব্বা তাঁর এবং বিশেষভাবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে খুবই হেয় চোখে দেখতেন। ঐ গ্রামের কয়েকটি খাঁ পরিবার ওখানে বসবাস করতেন। প্রত্যেক পরিবারের বার বাড়ির ঘর ছাড়াও আলাদা একটি বার বাড়ির ঘর ছিলো। এটায় প্রায়ই গল্প-গুজব, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে জোর চর্চা চলতো। আমিও মাঝে মধ্যে যেতাম ও ঐসব আলোচনার মজা ভোগ করতাম।

আমার লজিং মাষ্টার সাহেবকে চাচা এবং তাঁর বেগম সাহেবাকে চাচী বলে ডাকতাম। চাচীর স্বাস্থ্য তত ভাল ছিল না। রান্নায় তাঁকে সাহায্য করতে গিয়ে মোটামুটিভাবে শিখে ফেলি। এমন কি কুরমা পোলাউ পাক করতে পারি। ১৯৫৮ সালে আমেরিকায় যাই। ওখানে তের মাস থাকাকালে রান্না বেশ উপকারে আসে।

একদিন আহমদীয়ত নিয়ে জনাব আবদুর রহমান খাঁর সাথে তাঁর আব্বার আলোচনা খুব জমে উঠে। ২/১ জন এতে ইন্ধনও যোগাচ্ছিলেন। এসব আমি বসে বসে খুব উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ জনাব আবদুর রহমান খা'র আব্বা খুব রাগান্বিত স্বরে বলে উঠলেন- যদি আল্লাহ্ আইয়্যাও কয় তোর ধর্ম সত্য তবুও আমি তাকে মানবো না-কাইদ্দানী হবো না। তখন আমি বল্লাম, চাচা তা হলে আল্লাহ্কে মানা হয় কি? চাচা ঘর ছেড়ে যেতে যেতে বল্লেন, তুইও কাইদ্দানি হবে। আল্লাহ্র অসীম করুণায় ক্লাস এইটে পড়ার সময় প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদীয়ত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করি এভাবে চাচার 'তুইও কাইদ্দানি হবে' তা পূর্ণতা লাভ করে, আলহামদুলিল্লাহ্।

এক সেজদায় ৩ দিন

❑ ক্লাস সিক্স পর্যন্ত জায়গীরে ছিলাম। পড়ার চাপ বেড়ে যাওয়ায় গার্জিয়ানের মত নিয়ে বি-বাড়ীয়া অন্নদা হাই স্কুলের সাথে সংযুক্ত বোর্ডিংয়ে চলে যাই।

জনাব লাল মিয়া সাহেব ছিলেন আমাদের ড্রিল মাস্টার। তিনি প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আমার বড় ভাই তখন মরহুম প্রফেসর মোহাম্মদ আলী সাহেব বি-বাড়ীয়া অন্নদা হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। লাল মিয়া মাস্টার সাহেবের সাথে আমরা দুই ভাই বেশ পরিচিত ছিলাম। তিনি মধ্যে মধ্যে ড্রিলের আগে ধর্মের কথা বলতেন। একদিন হযরত বড়পীর সাহেব সম্পর্কে বল্লেন, ঘুম দেরীতে ভাংগায় ফযরের নামায আউয়াল অক্তের চেয়ে সামান্য দেরীতে পড়েন। তাতে যে গোনা হয়েছে তা মাফের জন্য তিনি ৩ দিন এক নাগারে সেজদায় পড়ে থেকে আল্লাহ্র দরবার হতে সব মাফ নিয়ে ফিরে আসেন।

আমি বল্লাম - স্যার ঐ ৩ দিনের কাযা নামাযের কি হবে? তিনি খুব রাগ করে বল্লেন- তোর বড় ভাইতো এরূপ বেআদব ছিলো না। অন্য কেউ হলে আমার ক্লাসে আর আসতে দিতাম না।

- মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

কবিতা

নামায

হৃদয় দিয়ে পড়বে যে কেউ
নামায দৈনিক পাঁচবার
হবে কবুল দোয়া তাহার
পড়বে নামায যতবার।
নামায যদি নাইবা পড়ে
হয়ে মানুষ মুসলমান
হবে কঠিন কতনা তাহার
রোজ হাশরের ময়দান?
আস্সলাতু খয়রুম মিনান্নাউম
ঘুমের চাইতে নামায ভাল
নামায হলো জীবনের আলো।
আস্সলাতু মে'রাজুল মু'মিনীন
জানে সকল মুসলিমীন।
সাচ্চা দীলে পড়লে নামায
সব মু'মিনের হয় মে'রাজ।
প্রতি নামাযের মোড়ে মোড়ে
হয় বলা 'আল্লাহু আকবর'।
- সদা যিনি শ্রেষ্ঠ সবার
সকল কিছুর মাতব্বর,
তাই তো বলা আল্লাহু আকবর।
অধিক সেজদায় লাভ হবে কি
হয় যদি না কবুল
স্বল্প সেজদাই যথেষ্ট হয়
যদি না হয় ভুল॥

- শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ

বিজয় দিবস ও নববর্ষের শুভেচ্ছা

বিজয় দিবস ও নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের সম্মানীত পাঠক-পাঠিকা বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

- পাক্ষিক আহমদী

সন্তান লাভ

পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদক ও মুরব্বী সিলসিলাহ (ঢাকা) মাওলানা আহ্মদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের মেয়ে কানাডা নিবাসী সাবীহা মাহমুদ ও জামাতা মোহাম্মদ শাহিদুজ্জামানকে আল্লাহ্তাআলা ৪ ডিসেম্বর, ২০০২ইং তারিখে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন, আল্হামদুলিল্লাহ্। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর খেদমতে তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ এবং পুণ্যবতী হওয়ার জন্য বিনীত দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

- নির্বাহী সম্পাদক

এস হাদীস শিখি

হাদীসের গুরুত্ব ও সংশ্লিষ্ট ক'টি প্রয়োজনীয় কথা

সাধারণভাবে হাদীস শব্দের অর্থ কথা। ইসলামী পরিভাষায় হাদীস বলতে বুঝায় আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র কথা ও কাজ এবং তাঁর (সঃ) সম্মুখে যে কথা বা কাজ করা হয়েছে যাতে তাঁর (সঃ) সমর্থন পাওয়া যায় তা-ও হাদীস নামে কথিত। হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র কালামের আদেশাবলীর সাথে সাথে নিজের কথা ও কাজ দ্বারা উহার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এর ওপরে মুসলমানদের এমনভাবে আমল করা জরুরী যেভাবে কুরআন করীমের অনুসরণ ও আনুগত্য আবশ্যক।

সুতরাং কুরআন করীম মুসলিম উম্মতকে লক্ষ্য করে বলেছে,

মা আতাকুমুর রসূলু ফাখুজূহু ওয়ামা নাহাকুম আনহু ফানতাহূ (সূরা হাশর ঃ ৮ আয়াত)।

অর্থাৎ রসূল (সঃ) তোমাদেরকে যা কিছু দেয় তোমরা উহা গ্রহণ করো এবং যাখেকে নিষেধ করে উহা থেকে বিরত থাকো।

এ আয়াতে করীমা দ্বারা ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন করীম ছাড়াও আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রত্যেক কথা ও প্রত্যেক কাজ যার মধ্যে ধর্মীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে নির্দেশ ও ব্যাখ্যা থাকে তা অবশ্য মান্য ও পালনীয়। এতদনুযায়ী আমল করা ও উহা মান্য করা মুসলিম উম্মতের জন্যে অবশ্য-করণীয়। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), যাঁরা সরাসরিভাবে নবী করীম (সঃ)-এর কাছ থেকে ইসলাম শিখেছেন, চর্চা করেছেন তারা নবী করীম (সঃ)-কে পদে পদে অনুসরণ করাকে নাজাত বা মুক্তির পথ বলে মনে করতেন। নবী করীম (সঃ)-এর ব্যবহারিক জীবন 'সুন্নত' নামে ইসলামী পরিভাষায় স্থান পেয়েছে। ইহা ইসলামী জ্ঞান শিক্ষার উৎস হিসেবে কুরআনের পরে দ্বিতীয় পর্যায়। তৃতীয় স্থানে হলো হাদীস। কালক্রমে ইসলাম যখন দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো তখন মুসলমানগণের পক্ষে সরাসরি নবী করীম (সঃ)-এর কাছ থেকে ইসলাম শিক্ষা করা সম্ভব হোল না, তাই সাহাবা (রাঃ)-গণের মাধ্যমে নবী করীম (সঃ)-এর কথা ও কাজের বিবরণ ধারাবাহিকতার সাথে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। যেহেতু কুরআনের আয়াত নাযিল হচ্ছিলো এবং ওহীর কাতেবগণ (লেখকবৃন্দ) তা লিখে রাখছিলেন তাই নবী করীম (সঃ) তখন হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তাঁর (সঃ) ইন্তেকালের পরে প্রায় ১০০/১৫০ বছর পরে যখন এ হাদীসের মধ্যে নানা প্রকার জাল - ভেজাল কথার সংমিশ্রণ আরম্ভ হোল তখন তা পুস্তকাকারে লিখে রাখার আবশ্যকতা অনুভূত হলো। তাই বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ইমাম মালেক, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমূখ বুযূর্গান ইহা সংকলন করা আরম্ভ করলেন। এভাবে হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হলো।

হাদীস তথা নবী করীম (সঃ)-এর কথা ও কাজের প্রতি আনুগতের যে কতখানি গুরুত্ব তা নিম্নোক্ত কুরআনী আয়াত থেকেও অনুধাবন করা যায়। মহান আল্লাহ্‌তাআলা বলেন,

কুল ইন কুনতুম তুহিববনাল্লাহা ফাত্তাবিউনী ইউহ্‌বিবকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফিরলাকুম যুনূবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহীম" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩২ আয়াত)।

অর্থ ঃ তুমি বলো, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করবেন আর আল্লাহ্ হলেন পরম ক্ষমাকারী ও বার বার কৃপাকারী।

যার ওপরে ধর্ম অবতীর্ণ হয়েছে তিনি ধর্মকে সবচে' অধিক ভালভাবে বুঝেছেন এবং সেভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। নবী করীম (সঃ) যে সবচে' অধিক ইসলাম বুঝেছেন ও এর ওপরে আমল করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রকৃত অনুসরণের মাঝেই আল্লাহ্ সন্তুষ্টি লাভ নিহিত। নবী করীম (সঃ) এখন আমাদের মাঝে নেই। তাঁর (সঃ) সুন্নত ও হাদীস আছে আমাদের নিকট রয়েছে। আমরা যদি তাঁর (সঃ) সুন্নত ও হাদীসের যথার্থ অনুসরণ করি তবে আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিভাজন হতে পারবো এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, দীর্ঘদিন পরে হাদীস সংকলন করতে গিয়ে স্বাভাবিক কারণেই হাদীসের মাঝে সংযোজন বা পরিবর্তন হয়েছে। তাই হাদীস বিশারদগণ বহু বিচার-বিশ্লেষণ করে হাদীসের শ্রেণীভেদ করেছেন। এমন কি বক্রতার যুগে বিভিন্ন ফিরকা বিভিন্ন হাদীসের সত্যাসত্যের ওপরে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এজন্যে হাদীসের মধ্যে নানা প্রকারভেদের সৃষ্টি হয়েছে। হাদীস শাস্ত্র সম্বন্ধে জানতে হলে সেগুলো সম্বন্ধেও জানা আবশ্যক। সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছেঃ

দিরায়াত ঃ দিরায়াত অর্থ সেই হাদীস যা আকলে সলীম (যথার্থ জ্ঞান) ও ঘটনায় প্রমাণ করে; এদের বিরোধী না হয়। দিরায়াতের সত্যাসত্য নিরূপণের জন্যে নিম্নোক্ত নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে ঃ

(১) হাদীস, কুরআন করীমের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশের ও তার সুস্পষ্ট ও অকাট্য আদেশের পরিপন্থী না হয়।

(২) হাদীস, নবী (সঃ)-এর সুন্নতের ও সাহাবা কেরাম (রাঃ)-এর সর্ববাদীসম্মত কার্যকরণের বিরুদ্ধে না হয়।

(৩) হাদীস, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রমাণিত ঘটনার বিরোধী না হয়।

(৪) হাদীস, বাস্তব সত্য ও সুস্পষ্ট জ্ঞানের বিরোধী না হয়।

রেওয়ায়াত (বর্ণনা) ঃ

রেওয়ায়াত অর্থ কিতাব লেখকগণের কাছে যেসব বর্ণনাকারীর মাধ্যমে হাদীস পৌঁছেছে তারা কারা, কত বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল, মনে রাখার দিক থেকে তাদের মান কী এসব দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেক্ষাপটে হাদীসকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

রাবি বা বর্ণনাকারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে আহাদীসের প্রকার ভেদ ঃ

(১) **মুতাওয়াতর (ধারাবাহিকতা)** ঃ ঐসব হাদীস, যার অর্থ সুস্পষ্ট আর ওগুলোর বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, বুদ্ধি-বিবেচনা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রস্তুত নয়।

(২) **মশহুর (বিখ্যাত)** ঃ ঐ হাদীস যার বর্ণনাকারী সনদের কোন অংশেও তিন থেকে কম নয়।

(৩) **আযীয (প্রিয়)** ঃ ঐ হাদীস, যার সনদের কোন অংশেও বর্ণনাকারী দুই থেকে কম নয়।

(৪) **গরীব (দুর্বল)** ঃ ঐসব হাদীস, যার সনদের কোন অংশে একজন বর্ণনাকারী অনুপস্থিত রয়েছেন।

রাবীদের গুণাবলীর দিক থেকে হাদীদের প্রকারভেদ ঃ

(১) **সহীহ্** ঃ ঐসব হাদীস, যার বর্ণনাকারী পুণ্যবান, খুবই বিশ্বস্ত, নামায রোযার পাবন্দ, শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজকে পরিহার করে চলেন, তার স্মরণশক্তি ও বোধশক্তি উত্তম, আর ঐ হাদীসের সনদ মুত্তাসীল অর্থাৎ মাঝখান থেকে কোন রাবী অনুপস্থিত নেই।

(২) **হাসান** ঃ ঐসব হাদীস, যার কোন বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তির মধ্যে কমতি আছে কিন্তু অন্যান্য গুণা পরিপূর্ণভাবে সঠিক রয়েছে। তাদের মধ্যে কোন প্রকার দুর্বলতা নেই।

(৩) **যয়ীফ** ঃ ঐসব হাদীস, যার বর্ণনাকারীদের মধ্যে সহীহ্ বা হাসান্ সম্বলিত শর্তসমূহ পাওয়া যায় না। যেমন হাদীদের বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কারও প্রশ্ন করার আছে বা বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি দুর্বল।

(৪) **মাওযু'** ঃ মিথ্যা হাদীস অর্থাৎ কোন কথা ভুল পদ্ধতিতে বা মিথ্যা মিথ্যা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপ করে দেয়া হয়েছে। অথচ তিনি (সঃ) এভাবে বলেন নি।

(৫) **মকবুল** ঃ ঐসব হাদীস, যা সহীহ্ হোক বা হাসান।

(৬) **মরদূদ** ঃ ঐসব হাদীস, যা যয়ীফ (দুর্বল) হোক বা মাওযু' (জাল)। এসব হাদীস বাতিল করার যোগ্য।

সনদ ঃ সনদ বলতে হাদীসের বর্ণনাকারীগণের ঐ ধারাবাহিকতা . যার মাধ্যমে হাদীস সংকলনকারীগণ বা পুস্তক লেখক ইমামগণ পর্যন্ত এসে পৌছেছে। যেমন ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যতে-হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী নিজ গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

حدثنا الحميدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصارى قال اخبرنى محمد بن ابراهيم التيمى انه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول "إنما الأعمال بالنيات"

এ দৃষ্টান্তে **হাদ্দাসানাল হামীদি** থেকে নিয়ে **কুল্লা সামিতু** পর্যন্ত বর্ণনাকে সনদ বলে আর হাদীসটি **ইন্নামা** শব্দ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

সনদের নির্ভরতার দিক থেকে হাদীসের প্রকার-ভেদ ঃ

(১) **মারফু'** ঃ ঐ হাদীস, যার সনদে হাদীস সম্বন্ধে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপ করা হয়েছে যেমন, বর্ণনাকারী বলে আমি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম থেকে এটা শুনেছি। অথবা তিনি (সঃ) একথা বলেছেন বা তিনি এটা করেছেন। যেভাবে ওপরের উদাহরণে এসেছে ইমাম বুখারীর বর্ণনাকৃত হাদীস মারফু'।

(২) **মুত্তাসিল** ঃ সেই হাদীস, যার সনদে ধারাবাহিকতা আছে। এটা বিচ্ছিন্ন নয় অর্থাৎ মাঝখানে কোন রাবী বাদ যায় নি। এর দৃষ্টান্ত-ও ওপরের হাদীস যা ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যেন ঐ হাদীসের সনদ মারফু'ও এবং মুত্তাসিলও।

(৩) **মুরসাল** ঃ ঐ হাদীস, যার সনদে সাহাবীর উল্লেখ নেই; একজন তাবেঈন (অর্থাৎ সাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্ম) বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে বলেছেন- এমন বলেছেন বা এমন করেছেন।

(৪) **মুনক্বাত্বে** ঃ ঐ হাদীস, যার সনদে সাহাবী ছাড়া অন্য কোন বর্ণনাকারী রয়েছে আর সনদের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

হাদীস গ্রন্থের প্রকারভেদ ঃ

হাদীসের গ্রন্থের প্রণয়নের রীতি অনুযায়ী, লেখা ও রচনার উদ্দেশ্য, ব্যক্তিগত পরিশ্রম এবং গভীরতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ঃ

(১) **মুসনাদ** ঃ হাদীসের সেসব গ্রন্থ যাতে প্রত্যেক সাহাবী কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীস বিষয়-বস্তুর শ্রেণীভেদ না করে আলাদা আলাদা একত্র করা হয়েছে। যেমন, প্রথমে হযরত আবূ বকর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীসগুলো, আবার হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীসগুলো, পরে হযরত উসমান (রাঃ) কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীসগুলো, এবং অনুমান করে অন্যান্য সাহাবাগণের হাদীস। যেভাবে মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ), যিনি বিভিন্ন সাহাবার বর্ণনা থেকে প্রায় ৪০ হাজার হাদীস সংকলন করেছেন। এর প্রণেতা হলেন হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (জন্ম ১৬৪ হিজরী মৃত্যু ২৪১ হিজরী।)

(২) **মু'জাম** ঃ হাদীসের সেই গ্রন্থ, যাতে প্রত্যেক উস্তাদ বা প্রত্যেক শহরের হাদীস বিষয়-ভিত্তিক না করে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন মু'জাম তিবরানী।

(৩) **জামে'** ঃ সেই গ্রন্থ, যাতে প্রত্যেক বিষয়ে হাদীস বিশেষ পদ্ধতিতে সাজিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যেমন, আকায়েদ (ধর্মীয় বিশ্বাস), আহকাম (আদেশ), আদব (শিষ্টাচার), মুআশেরাহ (সমাজ), তাসাওবুফ (সূফীবাদ), আখলাক (চরিত্র), তারিখ (ইতিহাস), তফসীর (ব্যাখ্যা) প্রভৃতি, যেমন জামে' সহীহ বুখারী, জামে' তিরমিযী।

(৪) **সুনান** ঃ সেই গ্রন্থ, যাতে কেবল আদেশ ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত হাদীসগুলো একত্র করা হয়েছে অর্থাৎ সেসব গ্রন্থ যা ফিকাহ্ সম্পর্কিত হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত। যেভাবে সুনানে আবূ-দাউদ, সুনানে নিসাঈ।

(৫) **সহী হায়েন (দু'টি বিশ্বস্ত হাদীসের গ্রন্থ)** ঃ সত্যাসত্যের মাপকাঠিতে হাদীসের দু'খানা বিরাট বিখ্যাত গ্রন্থ অর্থাৎ সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম ।

(৬) **সিহাহ্ সিত্তাহ্** ঃ সত্যাসত্যের দিক থেকে হাদীসের ৬ খানা বিখ্যাত গ্রন্থ অর্থাৎ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও নিসাঈ।

(এ তালিকায় মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উল্লেখ পৃথকভাবে এজন্যে করা হয় নি যে, এ গ্রন্থের সব হাদীস সহীহায়েন-এর মধ্যে সংকলিত হয়েছে)। (চলবে)

(সূত্র - হাদীকাতুস্ সলেহীন)

- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

Moons of Light

By Maulana Bashir Orchard, UK

The purpose of this short treatise is to reflect upon that intangible light which pervades and illuminates the countenances of those persons, who experience the presence of God to a lesser or greater degree. It is not the light of the Solar System generated by the Sun or electricity. It is Divine Light which manifests itself in different measure according to the individual in the same way that the light of the Sun manifests itself in different measure through the moon and planets according to their phase of positions and movements. Everyone is not the same. The faces of some individuals are more effulgent with the light of God than are the faces of other individuals. Alas, some show no light at all.

No doubt a person's face does light up due to various causes such as on receiving good and happy news; on meeting somebody whom one loves etc. In this treatise, attention is being focussed on the emanation of Holy Light which is of its own distinctive nature radiating from the countenance of those who are infused to a greater or lesser degree with the presence of God. This Divine Light has a beauty and effulgence of its own.

Prophets of God hold a special -relationship with their Maker. Their spiritual status is very high. According to the Holy Qur'an, they are sinless and exemplars of the Laws of God. The Glory of God shows in their faces. They may be likened to the spherical moon reflecting the light of the sun.

As is the way with Prophets, Moses(as) enjoyed communion with God to which his face bore testimony with holy light. We read in the Old Testament :

`When Moses came down from Mount Sinai with the two tables of testimony in his hands as he came down from the mountain, Moses did not know that the skin of his face shone because he had been talking with God.' (Exodus 34:29)

`The People of Israel saw that the skin of Moses shone'. (Exodus 34:35)

Similarly, in the New Testament there is a description of the bright countenance of Jesus(as) :

'And his face shone like the sun ... (Matthew 17:2)

Severting to the Old Testament, there is a clear prophecy foretelling the advent of the Holy Prophet(sa) of Islam who was raised in Arabia in the seventh century. His appearance has been described in glowing terms :

`His glory covered the heavens and the earth; and the earth was full of his praise. And his brightness was of the light.' (Habbakkuk 3:3-4)

Turing to the radiant appearance of the Holy Prophet(sa) of Islam, we learn :

`The face of the Holy Prophet shined like the full moon' (Shamail Tirmidhi)

`I have not seen anybody who has smiled more than the Holy Prophet'. (Abdullah bin Harith)

'He met everyone cheerfully and courteously'. (Husain bin Ali)

'Every time he saw me he smiled'. (Hareer bin Abdullah)

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad(as) was the founder of the Ahmadiyya Muslim community which he inaugurated in 1889 in Qadian, India. He claimed to be the expected Promised Messiah and Imam Mahdi by Christians, Muslims and followers of other religions also. He was in regular communion with God. He was suffused with the presence of God which he exuded at all times. We are moved by the inspiring prayer :

`O Allah, diffuse light into my heart and ears ;

Diffuse light on my eyes and on my tongue;

Diffuse light on my right and on my left;

Diffuse light above me and under me;

Engulf me in Thy light.'

Hadhrat Mirza Bashir Ahmad, son of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) has written that one of his devout disciples known as Munshee Sahib was asked what impressed him most about his personality. He replied;

`I have known Hazrat Mirza Sahib from a time earlier than the day he put forth his claim. Another face so pure and lit up with such spiritual light I have never seen in my life. That light and his magnetic personality were for me the greatest argument in his favour. What we constantly hungered was just an opportunity to have another look at that illuminated face.'

Bahai Abdul Rahman was another devoted disciple of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as). He described his countenance during the last moments of his life :

`There was a peculiar lustre on his face and a deep inner reflection tinged with an indefinable peace

and joy and a kind of bright spiritual light which shone on his countenance.'

In the Holy Qur'an, God states that his righteous servants who offer diligent prayers and strive to win His pleasure carry a distinctive mark on their faces :

`Thou seest them bowing and prostrating themselves in prayer, seeking grace from Allah and His pleasure. Their mark is upon their faces, being traces of prostration.'

The mark upon their faces is that of Divine light and not the mark which sometimes appears on the forehead of a worshipper from prostrations. It results from righteous living and prayerful devotions. There are many who go through mechanical prostrations from which they may even acquire a mark on their foreheads : but it is not and indication of piety. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) has pinpointed the significant reality of this spiritual sign which lights up the faces of His righteous servants :

`When a man is pure of heart, he does not need a multiplicity of miracles. One sign is enough to lead such a one to the right path if there be the fear of God in the heart.' (Braheen Ahmadiyya)

The East African Times published the following tribute to Hazrat Mirza Bashir Ahmad after his death. He was immersed in spiritual light which this humble writer has witnessed on many occassions :

`God has Blessed him with ample means and affluence but he led a very simple and a saintly life. He was accessible to everybody and dearly loved and revered by all. Tall in build and possessed of a charming personality beaming with love and kindness for all, he walked with the dignity of a prince very much like his holy father (Hazrat Mirza Ghulam Ahmad) the Promised Messiah. With a halo of piety about his face and his resonant voice, he captivated the hearts of those who met him and listened to his inspiring words. There is no doubt about it that with the passing away of Hazrat Mirza Bashir Ahmad the world has lost the Moon of Prophets.'

Righteous devotees of God thrive on Divine Light both in this world and in the world to come. They hunger for it and manifest it in every way. The departed souls are for ever praying for more light.

`... Their light will run before them and on their right hands. They will say, `Our Lord, perfect our light for us and forgive us ; surely Thou hast power over all things ...' (Holy Qur'an, Ch : 66, v. 9)

May we be worthy of receiving more light. All praise is due to Allah, the Lord of all the worlds.

Bashir Ahmad Orchard - served as a missionary in the UK for many years after the Second World War when he had been stationed in India. He also served as the editor of the Review for over 9 years.

WAY TO GET TO PEACE

(শান্তি লাভের পথ)

If you think you're afflicted with troubles in pain
যদি তুমি মনে কর তোমার অনেক যন্ত্রণা
And you feel that you are stuck in that chain
আর মনে কর তুমি যন্ত্রণার শেকলে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা
And don't know a better way to gain
আর এই আবর্তের বাইরে আসার পথ খুঁজে না পাও
A way out of the troubles which pour like rain
কোন বারিধারা যদি সকল বিপদ ধুইয়ে না দেয়
So then instead of feeling gloomy and sad
তাহলে হতাশ হয়ো না অথবা হয়ো না দুঃখিত ,
And inside of you feeling angry and mad
আর নিজেকে ধিক্কার দিও না, হয়ো না রাগান্বিত
You should think of things that all make you glad
তখন ভাবিও সেসব কথা যা তোমাকে দিয়েছিল আনন্দ
And can bring you peace to change all bad
আর ঐসব কিছু যা শান্তি আনতে পারে ভুলিয়ে সকল মন্দ

So whenever in your life you feel moppy and blue
জীবন যখন মনে হয় শুধু ঘন ঘটা সব দিক অন্ধকার
And think you need a word that surely is true
নিজস্ব জেন প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেতে চায় অন্তর
You should knock the door of prayers and view
তখন তুমি চরম সত্যের সন্ধানে করিও আন্তরিক প্রার্থনা
And you will certainly find God waiting for you
দেখবে আল্লাহ্ হাত বাড়িয়ে আছে, তোমাকে দিতে সান্ত্বনা
And another way to get to that peace my dear
দেখতে দেখতে খুঁজে পাবে শান্তি পাওয়ার আরও সুন্দর পথ
By letting go to worldly things you have here
যদি ত্যাগ করতে পার সকল পার্থিব ভোগের আকর্ষণ
And by keeping all promises that you made all year
সারা বছরের সকল ওয়াদা যদি পালন করতে পার
And then you will feel safe in Lord's loving care
তাহলে প্রভুর আশ্রয়ে নিশ্চয় পরম শান্তি পেতে পার।

English : **Seema Chowdhury** অনুবাদ ঃ মীর মোবাশ্বের আলী

পর্দা প্রগতির দিশারী

পর্দা মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা
(দ্বিতীয় কিস্তি)

সৃষ্টির আদিকালে মানুষের মাঝে মনুষ্যত্বের বিকাশের উষালগ্নে মানুষ লজ্জা নিবারণের জন্য আবরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তখন পেটের ক্ষুধা মিটানোর জন্য খাদ্য আহরণ, ভক্ষণ, যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্য নারী-পুরুষের দৈহিক মিলন এবং লজ্জা নিবারণের জন্য বিভিন্ন গাছের পাতার ব্যবহার তার স্বভাবজাত চাহিদা হিসাবে দেখা দেয়। কালক্রমে সভ্যতার আবির্ভাবের প্রেক্ষাপটে কাপড় উদ্ভাবনের ফলে লজ্জা নিবারণ ও শালিনতা বজায় রাখার জন্য কাপড় পরিবর্তন শুরু হয়। নর-নারী উভয়ের সম্ভ্রম, ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা, সৌন্দর্য ও সুসভ্যতার পরিচয় প্রকাশের জন্য পরিমিত কাপড় পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। তা দেহের স্বভাবজাত চাহিদার অপরিহার্য অঙ্গ। তাই লজ্জাশীলতা মানুষের মনুষ্যত্বের গুণাবলীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মনীষী সুইস বার্ণের ভাষায় "মানুষ তখনই পশুত্বে পরিণত হয়, যখন তার লজ্জা বলতে কিছুই থাকে না।" তবে পুরুষের তুলনায় নারী দেহটি অধিক কমনীয় হবার কারণে নারী দেহের অধিকাংশ অঙ্গ লজ্জাশীলতার অন্তর্ভুক্ত। সামগ্রীকভাবে নারী দেহটিকে লজ্জার স্থান হিসাবে অভিহিত করা হয়। তাই লজ্জা নারীর ভূষণ। আর ভূষণ রক্ষার বাহ্যিক রূপ হলো পর্দা। সেজন্য পর্দাকে নারীর স্বভাবজাত ভূষণও বলা হয়। পর্দাহীনতা নারীর স্বভাববিরোধী কাজ। কাজেই নারী যদি তার স্বভাবজাত চাহিদা লজ্জাশীলতা পর্দার বিধান পালনের মাধ্যমে বজায় রাখে তা হলে তার মান-সম্ভ্রম ব্যক্তিত্ব আত্মমর্যাদা ও অধিকার রক্ষা সম্ভব।

পক্ষান্তরে নারী যদি তার প্রকৃতি-প্রদত্ত বিধানকে জলাঞ্জলি দিয়ে নির্লজ্জ হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রদর্শনে বেড়ায় এবং পুরুষের সাথে অবৈধ চলাফেরা করে তাহলে উভয়ের মাঝে কাম প্রবৃত্তির তাড়নায় অবৈধ প্রেম সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। কখনও নির্যাতিত ও ধর্ষিত হয়। ফলে তার মান-সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাবোধ রক্ষা হয় না। জীবন ও সমাজ কলুষিত হয়। রুশোর ভাষায় "আত্মা কলুষিত হতে আরম্ভ করলেই মন আকারে সংকীর্ণ হতে থাকে"। অর্থাৎ জীবন বিভিন্ন পাপাচারে সংক্রামিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই মানুষ যেমন তার স্বভাবগত কারণেই মলমূত্র ত্যাগের পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকে তেমনি নারীকে তার স্বভাবগত চাহিদা লজ্জাশীলতা পর্দার মাধ্যমে রক্ষা করে নিজের আত্মশুদ্ধির কল্পে দেহের ও আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করা প্রয়োজন।

পর্দা ব্যভিচারমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে

মানুষ তার সীমাহীন জৈবিক তাড়নাকে বিবাহের মাধ্যমে কামসম্ভোগ চরিতার্থে সংগত ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা করলেও পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আবার অনেকে দুর্বার প্রবৃত্তির তাড়নায় বিভিন্ন যৌন সম্ভোগের নেশায় নিজেই পরিবেশ ও পরিস্থিতির মাঝে বিভোর হয়ে যায়। কেননা পরিবেশ মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবনের অস্তিত্ব প্রশান্ত ও সুস্থ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। ভাল পরিবেশ ভাল মানুষ তৈরী করে। তাই কথিত আছে, "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।" বর্তমান বিশ্ব বায়ু দুষণ, শব্দ দুষণ, পানি দুষণ, রাসায়নিক দুষণ ও মাটি দুষণ ইত্যাদি কারণে পরিবেশগত বিপর্যয়ে (Environmental Disaster) বিষাক্ত পরিমন্ডলে পরিণত হয়ে পড়ছে। তা থেকে বিশ্বের মানব বসতি রক্ষার জন্য বিশ্ববাসী সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এবং পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

কিন্তু এ বাহ্যিক পরিবেশগত বিপর্যয় হতে সর্বাধিক ভয়াবহ ও মারাত্মক হলো সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার পরিবেশের কারণে সৃষ্টি অবাধ যৌন-সম্ভোগের পরিবেশগত বিপর্যয় (Free sex environmental disaster)। ফলে আজ বিশ্বের মানব সমাজ অনেকাংশে অবাধ যৌনাচারের বিষক্রিয়ায় নৈতিক অবক্ষয়ে বিষাক্ত হয়ে গেছে। মানব মন ও সমাজে চরম অশান্তি নৈরাজ্য-নৈরাশ্য ও হতাশা বিরাজ করছে। মানব হৃদয় অশান্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। নর-নারী উভয়ে সুখের নেশায় যতই সঙ্গী পরিবর্তন করে জীবনের সুখ খুঁজছে এবং ভোগ বাড়াচ্ছে ততই সমাজের পরিবেশগত বিপর্যয়ের পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। নারীরা নর-পশু কর্তৃক প্রতিনিয়ত নির্যাতিত, নিপীড়িত ও ধর্ষিত হচ্ছে। দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এর ভয়াবহ চিত্র খুবই মর্মান্তিক ও পাশবিক। বিভিন্নদেশ আইন প্রয়োগ করেও প্রতিরোধের ভ্রান্ত পথের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হচ্ছে। কেননা মানব হৃদয়ে প্রবৃত্তির যে উত্তাল তরঙ্গ বিদ্যমান তা সম্ভোগের পথ উন্মুক্ত থাকলে আইনের মাধ্যমে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। প্রয়োজনের তাড়নার কাছে আইনের নিষেধ হার মানে। ফলে বর্তমান বিশ্বে নৈতিকতার পরিবেশ বিপর্যয়ের নিঃশব্দ বিষক্রিয়া মানব সভ্যতার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই এই নৈতিক অধঃপতনের পরিবেশ বিপর্যয় হতে মানব জাতির উদ্ধারকল্পে ব্যভিচারমুক্ত পুতঃ পবিত্র সমাজ গড়ার একমাত্র ব্যবস্থা-পত্র ইসলামী পর্দা প্রথা। পর্দা প্রথা নর-নারী উভয়ের অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশাকে বারণ করে এবং নিয়ন্ত্রিত ও সংযত রাখে। ফলে অবাধ যৌনাচারের দুষণমুক্ত সুস্থ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাতে নর-নারী উভয়ের মাঝে বিভিন্নমুখী সীমাহীন অবাধ যৌন আকাঙ্ক্ষার উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয় না। পশুত্বের প্রবৃত্তির তাড়না নিষ্ক্রিয় থাকে। নারীরা হিংস্র প্রকৃতির পুরুষের ধর্ষণ ও নির্যাতনের হাত হতে রক্ষা পায়। ফলে নারী সমাজের মান-সম্ভ্রম আত্মমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সকল ধর্মই ব্যভিচারকে নিষেধ করেছে। খৃষ্ট ধর্মের বাইবেলে-তোমরা ব্যভিচার করবে না বলে উপদেশ দিয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআন বলে, তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না (বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩)। অর্থাৎ ইহা জ্ঞানী আল্লাহ্তাআলা সরাসরি - ব্যভিচার করিও না বলে ব্যভিচারমুক্ত পূতঃ পবিত্র সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির নির্দেশ দিয়েছেন। তা অনেক ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থসহ। শুধু ব্যভিচার করাকে নিন্দা ও নিষিদ্ধ করে নি। বরং পর্দা প্রথার মাধ্যমে ব্যভিচারের দুষণমুক্ত পবিত্র ও সুস্থ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা-পত্র দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামী পর্দা প্রথা ব্যভিচার হতে মানব সমাজকে রক্ষার রক্ষা কবচ।

আলোচ্য ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। যেমন- বিদ্যুতে Negative এবং Positive তার থাকে। এ দুটো তার আলাদাভাবে কোন কাজে আসে না। তার দুটোকে পরিকল্পিতভাবে কোন বিদ্যুৎ অপরিবাহী বস্তু দিয়ে আবৃত করে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে ব্যবহার করলে তা থেকে অসংখ্য বিভিন্নমুখী সুফল পাওয়া যায়। কল্যাণ আসে। যদি তার দুটোকে আবৃত রাখা না হয় কিংবা আবৃতের মাঝে ছিদ্র থাকে অথবা অপব্যবহার করা হয় তাহলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মানুষের অপমৃত্যু ঘটে। ঠিক-তেমনি মানুষ তার প্রবৃত্তির তাড়নাকে পর্দা নামক অপরিবাহী বস্তুর মাধ্যমে আবৃত রেখে বিবাহের দ্বারা নির্ধারিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্ভোগ করলে তা থেকে অফুরন্ত, অনাবিল প্রশান্তি পায়। যদি পর্দার মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা

না হয় তথা অবাধ সম্ভোগ ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে বিদ্যুৎ-পৃষ্টের মত মানব জীবন নৈতিক অবক্ষয়ের বিষক্রিয়ায় পৃষ্ট হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই মানব স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে ব্যভিচারমুক্ত সুস্থ ও প্রাণবন্ত সমাজ তথা বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে পর্দা প্রথাকে একমাত্র পাথেয় হিসাবে পালন করা অত্যাবশ্যক।

পর্দা নারীর বন্দী দশা নয়

ইসলামের সমালোচকগণ পর্দা প্রথাকে নারীর বন্দী দশা বলে সমালোচনা করেন। কিন্তু ইসলামী পর্দার অর্থ নারীকে গৃহকোণে অবরোধবাসিনী করে রাখা নয়। সীমা, সময়, ক্ষেত্র ও নিয়মের মধ্যে থেকে একজন নারী প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে যেতে পারে। কাজ করতে পারে এবং পুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতে পারে। শুধুমাত্র নিজের শালীনতা, পবিত্রতা, সম্ভ্রম, মান-মর্যাদা ও অধিকার বজায় রাখার জন্য তার স্বাধীন চলাফেরার উপর নির্ধারিত পদ্ধতি দেয়া হয়েছে। আমরা সুসভ্য মানুষ হিসাবে পরিচিত হতে দেহের শালীনতা বজায় রাখার জন্য কাপড় পরিধান করি। নারী দেহটির অধিক শালীনতা বজায় রাখার প্রয়োজনেই সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখার মত পরিহিত কাপড় পরিধানের প্রয়োজন হয়।

প্রকৃতির দিকে তাকালে দেখা যায় যার মান-মর্যাদা যত বেশি সে তত বেশি পর্দার আড়ালে থাকেন। মহান প্রভুকে চর্ম চোখে দেখা গেলে হয়তো ভয়ে মানুষের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেত না হয় খোদার প্রতি মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা লোপ পেত। তিনি সর্বদা পর্দার আড়ালে গায়েব আছেন বলেই তার মর্যাদা ও অধিকার সর্বোচ্চ ও অতি মহান। দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর মান-মর্যাদা ও অধিকার বেশি বলেই তা রক্ষার জন্য তারা সর্বদা বেশি পর্দার আড়ালে ও নিরাপত্তায় অবস্থান করেন। তারা স্বাধীন চলা ফেরার মাঝে বিধি-নিষেধ ও পদ্ধতি পালন করেন। এটা তাদের জন্য বন্দীত্ব নয়। মর্যাদা, অধিকার ও নিরাপত্তা বজায় রাখার একটি উত্তম ব্যবস্থা। মানুষ প্রকৃতির তাড়নায় বাথরুম পর্দার আড়ালে অবস্থান করেন। এটাকে কেউ বন্দীত্ব বলে না। বরং কাউকে যদি কেহ বাথরুমে আটকিয়ে রাখে তা হবে তার বন্দীদশা। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের স্বভাববিরোধী কাজ বন্দীত্ব। আর স্বভাবসুলভ কাজ স্বাধীনতা।

নারীর লজ্জাশীলতা বজায় রাখার জন্য পর্দার আড়ালে থাকা তার স্বভাবসুলভ কাজ। কাজেই এটা তার বন্দীত্ব নয়। বরং বর্তমান বিশ্বে পুরুষ কর্তৃক প্রদত্ত নারী স্বাধীনতা নামে তাকে অধিক সাজ-সজ্জা করে পুরুষের সাথে চলাফেরা ও মেলামেশা করানোটা পুরুষের নিকট তাদের বন্দীত্ব প্রকাশ পায়। কেননা পুরুষের পশুত্ব তার সাথে আনন্দ উল্লাস, সুযোগ পেলে সম্ভ্রমহানী অর্থাৎ বিভিন্নভাবে তাকে ব্যবহার করে সুবিধা ভোগ করতে চায়। কিন্তু তাতে নারীর মান-মর্যাদা ও অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়। সে ভোগের পণ্য হিসাবে গণ্য হয়। তার সহস্র প্রমাণ আধুনিক নারী প্রগতিবাদী দেশগুলো সর্বাধিক বহন করে আছে। আমাদের সমাজেও তার দৃষ্টান্ত ভুরিভুরি। পর্দাহীনতার অবাধ মেলামেশার পরিণতি নিত্যদিন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে প্রেমের ফলশ্রুতিতে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। কখনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেই ধর্ষণের রূপ লাভ করে। পর্দাহীনতায় পুরুষের ফাঁদে বন্দী হওয়ার শেষ পরিণতি। ডেটিং থেকেই রেপের সৃষ্টি। সে জন্যই ইসলাম পর্দার বিধানের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে বারণ করেছে। তাই নারী সমাজের মান-মর্যাদা ও অধিকার রক্ষাকল্পে আধুনিক সুস্থ প্রগতিশীল সমাজ গড়ার লক্ষ্যে পর্দা পথের দিশারী হিসাবে ভূমিকা পালন করে।

পর্দা দেহের ও মনের

অনেকে যুক্তি আরোপ করেন পর্দা দেহের নয় মনের প্রয়োজন। মন ভাল ও পবিত্র থাকলে দেহকে চলমান তাবুতে পরিণত করার প্রয়োজন নেই। তাই এ সকল উদ্ভট যুক্তিবাদী মুসলমান মহিলাগণ পর্দা পালনে নারাজ। কিন্তু বিষয়টির উপর গভীর সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব। মানুষের মন পরিবর্তনশীল। খুবই আবেগ প্রবণ। সকল গতি সূত্রকে হার মানায়। কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন, "দুনিয়ার সবচেয়ে হেয়ালি হচ্ছে মেয়েদের মন"। আর দেহ-মন পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং মানুষের মাঝে পার্থিব সম্ভোগের প্রবৃত্তির তাড়না সীমাহীনভাবে কাজ করে। তাই মানুষের মাঝে ভুল, অন্যায় ও পাপাচারের প্ররোচনা সৃষ্টি হয়।

হাদীসে হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেন, যাদের স্বামী গৃহে নেই তাদের সাথে সাক্ষাৎ করিও না। কারণ শয়তান রক্তের প্রবাহের ন্যায় তোমাদের মধ্যে ধাবমান। আমরা (সাহাবীগণ) জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার মধ্যেও কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমার মধ্যেও, কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন এবং শয়তান আমার বশ্যতা স্বীকার করেছে (তিরমিযী)। হুযূর (সঃ) আরও বলেন, যখন কোন পুরুষ কোন স্ত্রী লোকের সাথে নির্জনে নির্জনে সাক্ষাৎ হয়, তখন অবশ্যই তাদের তৃতীয় সঙ্গী হয় শয়তান (তিরিমিযী)। সুতরাং প্রবৃত্তির তাড়নায় ও শয়তানের প্ররোচনায় পরিবেশ পরিস্থিতিতে মানুষের দ্বারা যে কোন পাপাচার ঘটতে পারে। কাজেই মনকে নিয়ন্ত্রণে রেখে দেহকে পবিত্র রাখার ধারণা বাতুলতা মাত্র।

আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে অনুভূতিহীন জড় পদার্থ, যন্ত্র বা দোষ ত্রুটির উর্ধ্বে ফিরিশ্‌তা করে সৃষ্টি করেন নি। মানুষ পশুত্বের তাড়নায় মানুষ খুন, নারী ও শিশু ধর্ষণের মত অসংখ্য জঘন্য কাজ করে অনেক সময় কৃত-কর্মের জন্য অনুশোচনা করে থাকে। মনকে যদি শুধু ভাল কাজে ব্যবহার করা যেত তাহলে তার দ্বারা অন্যায় কাজ হতো না এবং পরবর্তীতে নিজের অনুভূতিতে অনুশোচনার জন্ম হতো না। তাছাড়া কোন নারী যখন সুন্দর সাজ-পোষাকে সজ্জিত হয়ে বাইরে বের হয় তখন স্বভাবতই বিভিন্ন পুরুষের মনোমুগ্ধকর দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে সে দর্পিত পুরুষের দৃষ্টিতে ধর্ষিত হয়। সমাজে বেপর্দার বিষক্রিয়া সংক্রামিত হয়। কখনও উভয়ের ভাল-মন্দ লাগার আকর্ষণে অবৈধ প্রেম ও ব্যভিচারের ঘটনাও ঘটে। কেননা মানুষের মন মোমের মত। গলার স্পর্শ পেলেই গলে যায়। সেজন্যই মানুষের মাঝে প্রেম-প্রীতি ভালবাসা স্নেহ-মমতা সৃষ্টি হয়। আর তার কাছে দুনিয়ার সব বাধা হার মানে। মন বালির বাঁধের মত। যে কোন সময় মহা প্লাবনে দুর্যোগের ঘনঘটা ঘটিয়ে জীবনকে ধ্বংস করে। মন দেহ রক্ষার কাজে ব্যর্থ হয়। তাই মানব-প্রেমিক আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করিও না" (আহযাব ঃ ৩৪)।

তবে শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে কাপড় সর্বাঙ্গ জুড়ে থাকাকেও পর্দা বলা যায় না। পর্দা সকল ইন্দ্রিয়ের জন্য প্রযোজ্য। হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেন, "হাতের জিনা পর নারীকে স্পর্শ করা। চোখের জিনা পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা। মুখের জিনা পর নারীর সাথে প্রেমালাপ করা। পায়ের জিনা অবৈধ প্রেমাগ্নিতে পথ চলা। মনের জিনা অবৈধ প্রেমের কামনা করা" (বুখারী, মুসলিম)। কাজেই কেউ বোরকা পরে ভিতরে অপকর্ম করলে তাকে পর্দানশীন মহিলা বলা যায় না। অনেক দেহ পসারী মহিলাও বোরকা পরে পতিতাবৃত্তি করে থাকে। কাজেই যে প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক নয় সে প্রকৃত অর্থে পর্দানশীনও নয়। তাই তাকওয়াপরায়ণ পর্দানশীন হওয়াই পর্দা পালনের সার্থকতা। (চলবে)

- মোঃ জাহাঙ্গীর বাবুল

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা

হযরত ঈসা (আঃ) মারা গেছেন ঃ

বিশ্বনবী সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আখেরী যুগে আগমনকারী মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। প্রকৃতার্থে যখনই ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতার কথা উঠে তখনই প্রসঙ্গক্রমে মূসায়ী ঈসা (আঃ)-এর কথাও এসে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আগের ঈসাকে নিয়ে আমাদের এত মাথা ব্যথা কেন? হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলে গিয়েছেন, 'লাল মাহদীও ইল্লা ঈসা ইবনে মারইয়াম।' অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত মাহ্‌দী নেই। এ হাদীস পাঠে প্রত্যেক বিবেকপূর্ণ মানবাত্মার মনে হয়তো প্রথমেই এ প্রশ্ন জাগবে যে, তাহলে কি পূর্বের ঈসা মারা যান নি? অথবা তিনি কি আবার আসবেন? মারা গেলে কীভাবে আসবেন? তিনি কি আকাশে? আকাশে হলে কোন্ আকাশে? ইত্যকার নানাবিধ প্রশ্ন মানব হৃদয়ে উদ্বেলিত হওয়া অতি স্বাভাবিক। তাই এ প্রবন্ধে সর্বপ্রথম এ ভ্রান্তির অপনোদন অতি আবশ্যক।

এ বিষয়-বস্তু লিখার আগে একটি কথা স্পষ্ট করে নেয়া আবশ্যক- আর তা হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের পারস্পরিক সম্পর্ক। প্রত্যেক মুসলমান মাত্রই এ বিষয়ে সবিশেষ অবগত, কুরআন আল্লাহ্‌র গ্রন্থ। লওহে মাহ্‌ফুজ থেকে জীব্রাঈলের মাধ্যমে আমাদের নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত বাণী এ কুরআন, যাতে কোনই সন্দেহ নেই।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর অনেক পরে হাদীস সংকলিত হয়। তাই হাদীসে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এতে কিছু কথা উলট-পালট হয়ে থাকতে পারে। তবে কুরআনের পর সবচেয়ে প্রামাণ্য বিষয় হচ্ছে সুন্নাহ্। কুরআনকে বাস্তব জীবনে আমল করিয়ে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দেখিয়েছেন। সুন্নাহ্‌র পর হাদীসের স্থান। প্রামাণ্যতার দিক দিয়ে হাদীসকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। তা আবার পৃথক আলোচনার বিষয়-বস্তু।

কোন হাদীস আমাদের সম্মুখে এলে প্রথমেই আমরা তাকে অস্বীকার করবো না। আমরা দেখবো কুরআনের সাথে যদি খাপ খায় তবে সে হাদীস গ্রহণীয় হবে। এরপর যদি সরাসরি খাপ না খায় তাহলে ব্যাখ্যার মাধ্যমে এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আমলের কোন ঘটনার সাথে মিলিয়ে যদি দেখি হাদীসটি সঠিক এবং কুরআনের কোন আয়াতের প্রকাশ্য ও সরাসরি বিরোধী নয় তবে সে হাদীসটিও গ্রহণীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কুরআন মজীদে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বলা হয়েছে, "সিদ্দীকান্নাবীয়া" অর্থাৎ সত্যবাদী নবী। অপরপক্ষে সহীহ্ হাদীসে আছে, ইবরাহীম (আঃ) তিনবার মিথ্যা কথা বলেছিলেন। যে হাদীস প্রকাশ্যভাবে কুরআনের বিরোধী তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কুরআন বিরোধী কথা বলেছেন? নিশ্চয়ই না। যেহেতু মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর কয়েক শ' বছর পর হাদীস সংকলিত হয় সেহেতু বর্ণনাসমূহে অন্যের বর্ণনাকারীর নিজের কথা সংমিশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে।

এমন কোন হাদীস যদি থেকে থাকে যা ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত অথচ সহীহ হাদীস নয় যদি সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তাকেও সহীহ্ হিসাবে ধরে নিতে হবে।

আলোচনার মূল বিষয়-বস্তুর দিকে যাওয়ার আগে কুরআনের কষ্টিপাথরে আমরা দেখবো হযরত ঈসা (আঃ) কি জীবিত আছেন না মৃত। পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

"এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তাঁর পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই গত হয়েছে।"

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম হতবিহ্‌বলে ও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। হযরত উমর (রাঃ) নগ্ন তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘোষণা করেন, যে বলবে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মারা গিয়েছেন তার গর্দান চলে যাবে। এহেন পরিস্থিতিতে সৌম্যদর্শন ও মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর উপর প্রথম বিশ্বাস আনয়নকারী হযরত আবূ বকর (রাঃ) মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের লাশের নিকট গেলেন, চাদর উঠিয়ে হযরতের কপালে চুমু খেলেন এবং বললেন- খোদার কসম, তোমার উপর কখনোই দু'টি মৃত্যুকে একত্র করা হবে না (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও শারীরিক মৃত্যু)। এরপর তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে কুরআন পাকের সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। এবং এ আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যেকে এ বিষয়ে নিশ্চিত ও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মারা গেছেন এবং তাঁর পূর্বেকার সমস্ত রসূল গত হয়েছেন অর্থাৎ মারা গিয়েছেন। যদি ঈসা (আঃ) আকাশে জীবিত থাকতেন তাহলে সেদিন কেন হযরত উমর (রাঃ) এ প্রশ্ন উত্থাপিত করেন নি? এ কথাটি কি সহৃদয় ও বিবেকবান পাঠক একটু বিবেচনা করে দেখবেন?

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করবেন। এ প্রসঙ্গে সূরা মায়েদার ১১৭ ও ১১৮ আয়াত নিম্নে উপস্থাপন করছি।

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٧﴾

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٨﴾

এবং যখন আল্লাহ্ বলিবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া আমাকে এবং আমার মাতাকে দুই মাবূদরূপে গ্রহণ কর?' সে বলিবে, তুমি পরম পবিত্র, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না

যে, আমি এমন কিছু বলি যাহা বলার অধিকার আমার নেই। যদি আমি ইহা বলিয়া থাকিতাম তাহা হইলে অবশ্য তুমি উহা জানিতে। তুমি জান যাহা আমার অন্তরে আছে, কিন্তু আমি তাহা জানি না যাহা তোমার অন্তরে আছে। নিশ্চয় তুমিই অদৃশ্য বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞাতা।

আমি তাহাদিগকে কিছুই বলি নাই কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহার আদেশ তুমি আমাকে দিয়াছিলে যে, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্, যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, এবং আমি যতদিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম আমি তাহাদের উপর সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাহাদের উপর তত্তাবধায়ক ছিলে, প্রকৃতপক্ষে তুমিই সকল বিষয়ের উপর সাক্ষী;

সূরা মায়েদার ১১৮ আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, **ফালাম্মা তাওয়াফ্ফায়তানি কুনতা আন্তার রাকিবা আলায়হিম** - কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে- এ কথা উপরোক্ত দু'টি আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আঃ) মারা গিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে কখনো পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। কারণ ঈসা (আঃ) আল্লাহ্কে বলেছেন যে, তুমি আমাকে যা শিখিয়েছ তা ব্যতীত আমি তাদেরকে অন্য কিছু শিক্ষা দেই নি। অর্থাৎ প্রমাণিত হয় ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পরেই তারা ঈসা ও তাঁর মাতাকে দুই খোদা বানায়। অপরপক্ষে ঈসা (আঃ)-এর এ পৃথিবীতে আসারও কোন রাস্তা আর খোলা নেই। কারণ তিনি আল্লাহ্কে বলছেন, তুমিই তাদের উপর তত্তাবধায়ক আমি কিছু জানি না। যদি ভবিষ্যতে ঈসা (আঃ) এ পৃথিবীতে আসেন তাহলে তো তিনি খ্রীষ্টানদের ভুল আমল ও ভ্রান্ত বিশ্বাস দেখে যাবেন। তাহলে তিনি কীভাবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র সমীপে মিথ্যা বলবেন যে, তিনি কিছুই জানেন না? এ বিষয়ে কি একটু ভেবে দেখবেন যুক্তিবান পাঠক?

হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকাশে যাওয়ার অলীক বিশ্বাস খ্রিষ্টানগণ থেকে মুসলমানদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। তারাও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, ঈসা (আঃ) আকাশে রয়েছেন। অথচ পবিত্র কুরআন বলে সম্পূর্ণ উল্টো কথা। সূরা আলে ইমরানের ৫৬ আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেন -

"(স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আল্লাহ্ বলিলেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং আমার দিকে তোমাকে উন্নীত করিব ..."

এ আয়াত দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্তাআলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রথমে মৃত্যু দিবেন এবং পরে আল্লাহ্র দিকে উন্নীত করবেন। অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ যেভাবে আল্লাহ্র দিকে যায় হযরত ঈসা (আঃ) - ও সে ভাবেই গেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস 'মুতাওয়াফ্ফিকা'র অনুবাদ করেছেন "মুমিতুকা" অর্থাৎ আমি তোমাকে মৃত্যু দিব (বুখারী কিতাবুত্ তফসীর)। আল্লামা যামাখ্শরী, যিনি আরবী ভাষাবিদগণের অন্যতম, বলেন- 'মুতাওয়াফফিকা'র অর্থ আমি তোমাকে মানুষের হত্যা করা হতে রক্ষা করব, তোমার জন্য নির্দ্ধারিত পূর্ণ বয়ঃক্রম পর্যন্ত তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবো এবং তোমাকে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু দিব, তোমাকে নিহত হতে দেবো না (কাশ্শাফ)। আরবী ভাষাবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আলোচ্য আয়াতে যেভাবে তাওয়াফ্ফা ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয়েছে তখন এর অন্য অর্থ কোনক্রমেই হতে পারে না। সমস্ত আরবী সাহিত্যেও এ শব্দের অন্য অর্থে ব্যবহার কেউ দেখাতে পারবে না। পারলে দেখিয়ে দিক! পবিত্র কুরআনে ২৫ বার এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ২৩ বারই মৃত্যুর সময় আত্মাকে নিয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর দু'বার ঘুম ও রাত্রি শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে তাওয়াফ্ফাকে বিশেষিত করা হয়েছে (৬ঃ৬১ ও ৩৯ঃ৪৩)। হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন- নিশ্চয়ই ঈসা ইবনে মারইয়াম ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন (কানযুল উম্মাল ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড)।

এখন প্রশ্ন যৌবনে ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে আকাশে গেলে ১২০ বৎসর কীভাবে জীবিত ছিলেন?

আমরা নামাযে দু' সিজদার মধ্যবর্তী দোয়ার এক জায়গায় পড়ি "ওয়ারফা'আনী" আমাকে উন্নীত কর। এ দোয়া স্বয়ং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও বলেছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নবী, নবীগণের মুকুট, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্তাআলা আকাশে তুলে নেন নি অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের কথামত দেখা যাচ্ছে (নাউযুবিল্লাহ্) মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যে দোয়া কবুল হয় নি তা ঈসা (আঃ)-এর মত একজন গোত্রীয় নবীর বেলা পূর্ণ হলো! প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে বড় নবী কে? (হে আল্লাহ্! অহংকারের ফলে মানুষ যে পতনের সম্মুখীন তা হতে তুমি আমাদেরকে রক্ষা কর)। ১৮৯১ সনে ইমাম মাহ্দী (আঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইযালায়ে আওহাম এ তিরিশটি আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, ঈসা (আঃ) মারা গেছেন।

ফত্হে ইসলাম পুস্তকে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একটি ইলহাম উল্লেখ করেন যাতে বলা হয়-

"ঈসা ইবনে মারইয়াম ফওত হো চুকা হ্যায়। আওর উসকে

রাঙমে ওয়াদা কে মুআফিক তু আয়া হ্যায়।"

অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারইয়াম মারা গেছে। তাঁর রঙে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তুমি এসেছ। (চলবে)

- এহসানুল হাবীব (জয়)

'আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

প্রকৃত মুসলমান কে?

আজ আমরা সমাজের মাঝে যে নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তার মধ্যে ধর্ম নিয়ে যে সমস্যা তা সবচেয়ে বড় বলে মনে হয়। যেখানে বলা হয়েছে, "ধর্ম সহজ"; কিন্তু সমাজে ধর্মকে এত কঠিনরূপে প্রকাশ করার পিছনে কোন্ যুক্তি মাথা ঘামাচ্ছে তা বুঝা মুশকিল'।

বর্তমানে কেন ধর্ম নিয়ে এত মারামারি কাটা-কাটি, মসজিদ পুড়ানো, পবিত্র কুরআন পুড়ানো, নামাযরত অবস্থায় মুসল্লিকে হত্যা করা, নিরীহ মুসলমানকে অত্যাচার করা ইত্যাদি চলছে? কে প্রকৃত মুসলমান আর কে অমুসলমান এ নিয়ে সমাজে চলছে কলহ বিবাদ। ইসলাম তো এ শিক্ষা দেয় না যে, ধর্মের নাম নিয়ে সমাজে নানা ধরনের অপকর্ম চালিয়ে যাও বরং ইসলামের শিক্ষা হলো যার যার ধর্ম কর্ম নিজ নিজ মতে নিজ নিয়মে পালন করতে পারবে এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম প্রচার করতে পারবে। যদি আমরা ইসলামের গোড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখা যাবে, ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য কত উচ্চ মার্গের ছিল! সে যুগে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বিধর্মীদের সাথে চুক্তি করছেন। তার মধ্যে প্রথমে ছিল ধর্ম নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করা যাবে না। সবাই সবার নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। যেমন ভাবে সূরা আল্ কাফিরূনে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য আর আমাদের ধর্ম আমাদের জন্য। আবার সূরা বাকারার ২৫৬ আয়াতে বলা হচ্ছে, ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই। কিন্তু আজ যদি আমরা ইসলামের দিকে তাকাই তা হলে দেখতে পাই, উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াত ও রসূল করীম (সঃ)-এর কথার উপর আমল না করে সমাজে চলছে তার উল্টোটা। আজ মনে হয় ইসলাম বিভিন্ন ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে ধর্ম ব্যবসায়ীরা ইসলামী নাম দিয়ে যা খুশি তা করে যাচ্ছে। ধর্মের নাম নিয়ে মানুষ হত্যা করছে আর বলছে আমরা ইসলামের পক্ষে জেহাদ করছি। যে কোন বিষয়ে ফতওয়া দিয়ে পয়সা কামাচ্ছে আর ইসলামের ভিতর নতুন নতুন আইন-কানুন গড়ে তুলছে।

আজ আমরা দেখতে পাই সমাজের একদল আরেক দলকে কাফির আখ্যা দিয়ে রেখেছে। যদি জরিপ করে দেখি তা হলে মনে হয় এমন কোন ফের্কা বা সম্প্রদায় নেই যারা কাফির ফতোয়ার সামিল নয়। আসুন নিজ চোখে দেখি কোন্ সম্প্রদায় কোন দলকে কাফির বা অমুসলমান বলে আখ্যা দিয়ে রেখেছে ঃ

বেরেলভী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দেওবন্দীর ফতওয়া ঃ

" যে ব্যক্তি আল্লাহ্ জাল্লা শানূহু ছাড়া অপর কাউকে আলেমুল গায়েব (অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত) বলে সাব্যস্ত করে আর আল্লাহ্র সমপর্যায়ে অন্য কারও জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করে সে নিঃসন্দেহে কাফির। তার ইমামতি তার সাথে মেলামেশা তার প্রতি সৌহার্দ্য প্রকাশ সব হারাম" (আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী) প্রণীত ফতওয়ায়ে রশিদীয়া কামেল ঃ পৃঃ ৩২, প্রকাশক মুহাম্মদ সাঈদ ১৮৪৩-৮৪)।

শিয়াদের বিরুদ্ধে দেওবন্দী আলেমদের ফতওয়া ঃ

"শিয়ারা কেবল মুরতাদ কাফির আর ইসলাম বহির্ভূতই নয় বরং তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের এমন শত্রু যা অন্যান্য সম্প্রদায়ে কম পাওয়া যাবে। মুসলমানদের এ ধরনের লোকদের সাথে সব রকমের সম্পর্কচ্ছেদ করা উচিত। বিশেষ করে বিয়ে -শাদীর ব্যাপারে" (মৌলানা মোহাম্মদ আব্দুশ শাকুর, লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত ১৩৪৮ হিজরী সনে প্রকাশিত ফতওয়া)।

আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ফতওয়া ঃ

সত্তর জন দেওবন্দী আলেম কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফতওয়া জারী করে তাতে আহলে হাদীস সম্প্রদায়কে কাফির ফতওয়া দেন এবং বলেন যে, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা, তাদের মসজিদে প্রবেশ করতে দেয়া শরীয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ এবং ধর্মের জন্য ফিৎনা ও ভয়ের কারণ" (বিজ্ঞাপন, আবূ আলাই ইলেকট্রিক প্রেস, আগ্রা থেকে প্রকাশিত)।

জামায়াতে ইসলামী ও এর প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে ফতওয়া ঃ

"মওদুদী সাহেবের লেখা বই-পুস্তকের উদ্ধৃতি দেখে প্রতীয়মান হয়, তার ধ্যান-ধারণা ইসলাম ধর্মের পথ-নির্দেশক, সমস্ত ইমাম এবং সম্মানিত সব নবীর শান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে ধৃষ্টতা ও -অবমাননায় ভরপুর। তিনি যে নিজে পথভ্রষ্ট ও অপরকে পথভ্রষ্টকারী এতে কোন সন্দেহ নেই। হুযূর আকরম (সঃ) বলেছেন, প্রকৃত দাজ্জালের আগমনের পূর্বে আরও ত্রিশজন দাজ্জাল জন্ম নিবে, যারা আসল দাজ্জালের পথ সুগম করবে। আমার জ্ঞান ও ধারণা মতে সেই ত্রিশ দাজ্জালের মধ্যে একজন হলো মওদুদী।"

(মৌলানা মুহাম্মদ সাদেক, মোহতামীম, মাদ্রাসা মাযহারুল উলুম, করাচী প্রদত্ত ফতওয়া, ২৮শে যিলহজ্জ ১৩৭১ হিঃ)।

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে চরমোনাই-এর পীরের প্রকাশ্য ফতওয়া ঃ

জামায়াতে ইসলামী কোন ইসলামী দলই নয়। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের লোকেরা অবাক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন চরমোনাই ও দেওয়ান বাগীদের লড়াই।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বুঝতে পারছি, বর্তমান আর কেউ প্রকৃত মুসলমান আছে কিনা সন্দেহ হয়। দেখা যায় সকল সম্প্রদায়ই কাফির বা অমুসলমান হয়ে আছে। যদি সবাই কাফির হয়ে থাকে তা হলে কি দেশে আর কোন মুসলমান নেই (নাউযুবিল্লাহ্)। পাঁচ বেলার আযান হচ্ছে তা কি লোক দেখানো, কলেমা, নামায, রোযা, যাকাত হজ্জ সব মেনে যে পা রাখছে সামনে তা-ও কি মিথ্যে?

আমরা লক্ষ্য করছি, বর্তমান সমাজে যারা প্রকৃত আল্লাহ্ ও রসূলের অনুসারী তারাও নাকি অমুসলমান। রসূল করীম (সঃ) তো বলছেন, "মুসলমান হলো সে যার মুখ ও হাত হতে অন্যান্য মুসলমানরা নিরাপদ" (মুসলিম)।

আজ আপনারা চিন্তা করে দেখুন এমন কোন ইসলামী দল নেই যারা হাতে না পারুক মুখে হলেও অপর দলের লোকদের নানাভাবে মিথ্যা অভিযোগ করে বিপদে ফেলছেন। পৃথিবীতে আজ একটিই জামাত রয়েছে যার অনুসারীরা অপর কোন মুসলমান ভাইকে কোনরূপ কষ্ট দিতে প্রস্তুত নয় আর তারা হলো আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর অনুসারী। তাদের ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে নিজে পড়ে বুঝুন কেমন বিশ্বাসে তারা বিশ্বাসী। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস নিম্নরূপ ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলহে" পুস্তকে বলেছেন ঃ "আমরা ঈমান রাখি যে, খোদাতাআলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র রসূল খাতামাল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্তাআলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এ ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দু মাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ-করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** এর উপর ঈমান রাখে এবং এ ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাঁদের সত্যতা প্রমাণিত এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতাআলা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযূর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদিসম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে। সে সব সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে সে তাক্ওয়া বা খোদাভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখে ছিল যে, আমাদের এ অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এ সবের বিরোধী ছিলাম?" "আলা ইন্না লা' নাতাল্লাহে আলাল কাযিবীনা ওয়াল মুফতারীয়ীনা" অর্থাৎ সাবধান! নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত।

এখন আপনারা চিন্তা করে দেখুন এ ধর্ম-বিশ্বাসের মাঝে কি কোন অ-ইসলামিক কথা বার্তা রয়েছে না সব ইসলামসম্মত কথা। যদি সব কথাই ইসলামসম্মত হয়ে থাকে তাহলে কেন আজও এই ইসলামী দলকে কাফির বা অমুসলমান বলা হচ্ছে?

তারা কি আজ পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পড়ছেন না বা শুনেন নি যেখানে খোদাতাআলা বলছেন, "যে তোমাদেরকে সালাম দেয় তাদেরকে তোমরা বলো না যে, তুমি মু'মিন নও" (সূরা নিসা ঃ ৯৫)।

এখানে শুধু সালামের কথা বলা হচ্ছে, যারা সালাম দেয় মাত্র তাদেরকেও কেউ বলতে পারবে না যে, তোমরা মু'মিন নও তা হলে চিন্তা করে দেখুন আজ ইসলামকে কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লারা।

'আল্লাহ্তাআলা সূরা হুজুরাতের ১৫ আয়াতে বলছেন, "যারা নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে তারা মুসলমান বলে প্রমাণিত হবে"।

আল্লাহ্তাআলার এ কথার পরে ও কি কারও সন্দেহ থাকতে পারে কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়?

রসূল করীম (সঃ) বলছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে এবং আমাদের ক্বিবলামুখী হয় এবং আমাদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করে সে এমন মুসলমান যার দায়িত্ব আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূল গ্রহণ করেছেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করো না" (বুখারী)।

কত সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে যেন কেউ আল্লাহ্র দায়িত্বে হস্তক্ষেপ না করে কিন্তু আজ লক্ষ্য করুন যারা সমাজে প্রকৃত ইসলাম প্রচার করছে, যারা কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত নয়, যাদের মাঝে নাই ধর্মীয় কোন ব্যবসা, যারা চলে খোদার খলীফার আদেশে তারা নাকি কাফির অ-মুসলমান আর আল্লাহ্র রসূল বলছেন, "যার হাত ও মুখ হতে অন্যরা নিরাপদ তারাই প্রকৃত মুসলমান"। আজ তারা মুখে গালি দিচ্ছে, হাতে মসজিদ ভাঙ্গছে, মার-পিঠ করছে আর বলছে আমরাই ইসলামের এক মাত্র সেবক। বলুন ইসলাম কি নিজ কথা মত চলবে না খোদা ও রসূলের কথা মত চলবে? আজ যদি কেউ বলে, আমরা কোন্ মুসলমান দলের অনুসরণ করবো, তা হলে প্রথমে ভাবতে হবে কোন্ দলের হাত ও মুখ হতে অন্যরা নিরাপদ তা হলেই পেয়ে যাবেন প্রকৃত মুসলমান দল। কারণ খোদা ও রসূল-প্রেমিক দল কোন সময় অন্যের উপর আঘাত আনে না। তাই আসুন আমরা প্রকৃত ইসলাম, যে ইসলাম খোদার ইসলাম, যে ইসলাম রসূল (সঃ)-এর ইসলাম সেই ইসলামে যোগ দেই, তা হলেই এ জীবন সার্থক। খোদা সকলকে প্রকৃত ইসলামে যোগদানের তৌফীক দান করুন, আমীন।

- মাহমুদ আহমদ সুমন
মোয়াল্লেম

তোমরা তোমাদের মৃতদের ভালভাবে স্মরণ করো- আল্ হাদীস

মরহুম আব্দুল লতিফ স্মরণে

মরহুম আব্দুল লতিফ, পিতাঃ আহমদ আলি হাওলাদার, গ্রাম ঃ গংগাপুর, থানা ঃ হিজলা, বরিশাল।

বাংলাদেশে আহমদী জামাতের বর্তমান প্রেক্ষাপটে জামাতের যাঁরা চলে গেছেন চিরতরে তাদের জীবন হতে কিছু তুলে ধরতে গিয়ে প্রথমে আমি মরহুম আব্দুল লতিফ, যাঁর নাম হয়তো ইতিহাসের পাতায় লেখা রবে না; কিন্তু আমার স্মৃতির পাতায় আজও ভাস্বর হয়ে আছেন এ ব্যক্তিটি তাঁর আদর্শে ও গুণে।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শী আর বিচক্ষণ ব্যক্তিটিকে সৌভাগ্যক্রমে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের ২য়া ভগ্নীর (সাথীর) জামাতারূপে।

তাঁর চরিত্রের সব দিকগুলোই ছিল অসাধারণ। সবদিকগুলো আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমাকে যে দিক বেশি নাড়া দেয় সেটা হচ্ছে তাঁর আদর্শকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া যাতে সকলেই উপকৃত হতে পারে।

যেমন, ১৯৫৬ সালে তিনি একটি উক্তি করেছিলেন ঃ I am proud of my poverty উক্তিটিকে বিশ্লেষণ করার আগেই বুঝে নিতে কষ্ট হবে না যে, তিনি আভিজাত্যের মধ্যে ছিলেন না।

কিন্তু তাই বলে তিনি দারিদ্রকে ভয় পেতেন না। দারিদ্রতায় তিনি গর্ববোধ করতেন। কারণ তিনি চারিত্রিক দিক দিয়ে ছিলেন ভিন্ন রকমের এক পুরুষ। চাকুরী জীবনে তিনি ছিলেন বরিশাল কালেক্টরীতে ল্যান্ড একুইজিশন সেকশনের কর্মকর্তা। লোন-সেকশনেও চাকুরী করছেন। বন্দুক লাইসেন্স বিভাগেও ছিলেন অনেক দিন। তখনও সেখানে ঘুষের ছড়াছড়ি ছিল। টাকা-পয়সা আয় করার অনেক সুযোগ ছিল কিন্তু তা বৈধ ছিল না বিধায় তিনি তা কখনোই গ্রহণ করেন নি। এর প্রমাণ তাঁর কোন বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি বা কোনই এ্যাসেট নেই। একমাত্র বিধবা স্ত্রী, ছেলেমেয়েই ছিল তাঁর এ্যাসেট। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার সময় না পেয়ে চলে গিয়েছেন আল্লাহ্‌র নিকট।

এত গুণের ও আদর্শের পরিচয় তিনি দিয়েছেন বিধায় আজও তিনি সকলের কাছে অমর হয়ে আছেন।

আমার পিতা মরহুম বদিউজ্জামান ভূঁইয়া আমার মরহুম নানাজান এর নিকট একদিক দিয়ে ঋণী ছিলেন। এ জন্য তিনি তাঁর বাধ্যগত ছিলেন। আমার পিতা তখন নতুন আহমদীয়ত গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে নানাজান আমার ২য় বোন রওশন আরা বেগমের (সাকী) বিয়ের কথা নিয়ে লতিফ মিয়াকে সাথে করে চট্টগ্রাম চলে আসেন। নানাজানের আদেশ রক্ষা ছাড়া মৌলভী বাবা ও আম্মার কোন গতি ছিল না।

কিন্তু মরহুম মোহাম্মদ সাহেব, প্রাক্তন আমীর এ বিয়েতে আপত্তি জানালেন। চট্টগ্রামেই থেকে মরহুম লতিফ সাহেব আমাদের বই-পুস্তক পড়ে ২/৩ দিনের মধ্যে আহমদীয়ত কবুল করেন এবং বিয়ে হয়ে যায়। তাতে আহমদী পিতা জামাতের তরফ হতে মৃদু শাস্তি পান। কয়েক বছর পর মরহুম আবদুল লতিফ সাহেব আহমদীয়তের গুণে মুগ্ধ হয়ে মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের হাতে দ্বিতীয়বার বয়াত নেন। তাঁর জীবনের সব দিক হয়েতো আলোচনা করতে পারবো না। কিন্তু কয়েকটি দিকের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। যেমন ঃ

আমরা জানি, যে দারিদ্রতা সকলকেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে কিন্তু এটা যে সব সময় ঠিক নয় তা তিনি প্রমাণ করেছেন। এতো গেল নীতি ও আর্দশের কথা।

আরো কিছু ভাল গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যেমন তিনি সব সময় সত্য কথা বলতেন এবং সত্যের আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। পরবর্তীতে এ শিক্ষা তাঁর সন্তানদের মধ্যে পালন করার চেষ্টা করেছিলেন।

সকলের উপকারে আসতেন এবং যদ্দুর সম্ভব নিজেকে অন্যের প্রয়োজনে লিপ্ত রাখার চেষ্টা করতেন। তাঁর নিকটতম আত্মীয়-স্বজন অনেক ধনী ছিলেন। সকলেই এক বাক্যে গর্ব করতেন বংশে আছেন আমাদের একজন সত্যের প্রেমিক লতিফ।

তিনি তাঁর কর্তব্যে ছিলেন অচল-অবিচল, পিতা-মাতার প্রতি তাঁর যে কর্তব্য তিনি যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেছেন। অসাধারণ এ ব্যক্তিটির এত গুণের ভীড়ে আরেকটি কথা না বললে কম হয়ে যাবে। তিনি জ্ঞানেও ছিলেন দক্ষ সৈনিক। ভাষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইংরেজী সব কিছুতেই তাঁর ছিল সমান পারদর্শিতা। তিনি ইংরেজী ভাষায় এত দক্ষ ছিলেন যে, মাঝে মাঝে তাঁর চিঠি পড়তে আমাদের ডিক্সনারী খুলতে হ'ত। সত্যের প্রেমিক কথাটি তাঁর আত্মীয়-স্বজন এ জন্যই বলেছেন যে, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) হলেন চিরসত্য আর এ সত্যের প্রেমিক ছিলেন লতিফ সাহেব। সৎ এবং আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে তাঁর তুলনা আমি করতে চাই না। কিন্তু একটা ছোট সত্য ঘটনা উল্লেখ করছি। আমি ঐ বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। তিনি তখন চাকুরীতে ছিলেন বন্দুক সেকসনে তখন এক ব্যক্তি কোন সুবিধা আদায়ের জন্য তাঁর বাসায় বেশ কিছু মিষ্টি এবং টাকার বান্ডেল নিয়ে যায়। ছেলে-মেয়েরা সেই মিষ্টি পেয়েতো বেজায় খুশী। তিনি বাসায় এসে ঐ লোকগুলিকে দেখে বল্লেন, "আমিতো অফিসে আপনাদিগকে মিষ্টি ভাষায় আমার আদর্শ ব্যক্ত করে আপনাদিগকে বিদায় করেছি। আবার আমার বাসায় কেন এলেন"? বাসার ভিতরে ঢুকে লতিফ সাহেব যে চেহারা সকলকে দেখিয়েছিলেন তা আমি ভুলতে পারবো না কোন দিন। মিষ্টি ফেরৎ দিয়ে ঐ লোকগুলোকে বিদায় দিলেন কঠোর ভাষায়। তিনি তাঁর আদর্শের কাছে নতি স্বীকার করেন নি।

তিনি জানতেন, সৎ থাকার পুরস্কার তিনি পাবেন এবং বাস্তবে তা হয়েছিল বটে। তাঁর কাজে খুশী হয়ে ডিসি বরিশালের কালেক্টর তাঁকে কিছু জমি উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা তিনি গ্রহণ করেন নি এবং বলেছিলেন, আমার থেকে অনেক গরীব আছে, তাদেরকে এটা দিলে উপকার হবে।

অসাধারণ গুণসম্পন্ন এ ব্যক্তিটি দুনিয়াতে যে সম্মান পেয়েছিলেন তেমনি আখেরাতেও পুরস্কার পাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

১৯৭৯ সালের ৪ জুন অফিসের কাজে সফরের সময় লঞ্চ ডুবিতে বিধাতা এ ব্যক্তিটিকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর জানাযা দু'বার হয়েছিল। গয়ের আহমদীরা তাঁর জানাযা পড়েছিলেন কারণ হাজার হাজার মানুষকে বাধা দেয়ার শক্তি ২/৪ জন আহমদীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু স্মরণপটে তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে অবশ্যই স্থান দিবেন এটা আমাদেরও আরজ আল্লাহ্‌র সমীপে।

আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলীফার সাথে তার বিশেষ যোগাযোগ ছিল। তবলীগের মাঠে নিজ খরচে তাঁর অবদান অনেক। তবলীগের জন্য তিনি শিক্ষিত সমাজকেই বেশি স্থান দিতেন। মটর লঞ্চ, স্টীমার, ট্রেনে তিনি তবলীগ করতেন এবং আহমদী জামাতের পুস্তক বিতরণ করতেন। কেউ তাঁর সাথে কোন দিন খারাপ ব্যবহার করে নি। তাঁর বলার ভঙ্গিমা ছিল অসাধারণ। তিনি বলতেন, মানুষের মন জয় করতে হলে প্রথমে নিজেকে সবদিক দিয়ে সিরাতুল মুস্তাকীমে চলতে হবে এবং দোয়ায় রত থাকতে হবে। আমিত্ব ভাব মুছে ফেলতে হবে, সত্য কথা বলতে হবে, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে জামাতের নেযাম আঁকড়িয়ে থাকতে হবে।

- ডাঃ মেজর অবঃ আসাদুজ্জামান

কুরআন মজীদের অত্যুজ্জ্বল শান ও মকাম

মহান আল্লাহ্‌তাআলা যখনই পৃথিবীতে কোন মহাপুরুষ পাঠিয়েছেন তখন তাঁর দায়িত্বাবলী সম্বলিত কিছু বিধান তাঁকে প্রদান করেছেন। প্রত্যেক নবীই আল্লাহ্ কর্তৃক বাণী প্রাপ্ত হয়েছেন। কোন না কোন সহীফা পেয়েছেন। এ ধারাবাহিকতায়ই আমাদের প্রভু ও নেতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ নবী আখ্যায়িত হয়ে পূর্ণাঙ্গ ও শ্রেষ্ঠতম বিধান লাভ করেছেন, যা পবিত্র কুরআন নামে আখ্যায়িত। এ কুরআন সকল মহৎ শিক্ষাকে একত্র করেছে। সকল নবী ও তাঁদের সময়কার হারিয়ে যাওয়া সঠিক চিত্র আমাদের সামনে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করেছে।

সকল নেয়ামত আর কল্যাণ এ কুরআনে নিহিত। তাই এ কেতাবের কল্যাণ সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক।

সুধী পাঠকবৃন্দ!

পবিত্র কুরআনেই এর কল্যাণ সম্বন্ধে ঘোষণা রয়েছে ঃ "এবং এ কুরআন যা আমরা ধীরে ধীরে নাযেল করেছি তা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমতস্বরূপ (১৭ঃ৮১)।

"এর মাঝে স্থায়ী আদেশাবলী (শিক্ষাবলী) সন্নিবেশিত আছে" (৯৮ঃ৪)।

পবিত্র কুরআন শুধু মুসলমানদেরকেই সম্বোধন করে না বরং সমগ্র মানব জাতিকেই সম্বোধন করে এবং ঘোষণা করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জগতের জন্যই আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। আর সাথে সাথে এ দাবীও করে যে, কুরআনই ঐশী বিধানের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী। এর শুরুতেই বলা হয়েছে **হুদাল্লিল মুত্তাকীন** অর্থাৎ মুত্তাকীনদের হেদায়াত বা সৎপথ প্রদর্শনের জন্য পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ (২ঃ৪)।

কুরআন মজীদের শিক্ষার মাঝে মানব জীবনের সর্ব প্রকার স্বার্থ ও যাবতীয় কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে সার্বজনীনভাবে অনুসরণ করে চলা সম্ভব।

পবিত্র কুরআন সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অধিকার ও দায়িত্বের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে যাতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সংক্রান্ত যাবতীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত নির্মূল করে সমাজ ব্যবস্থায় পূর্ণ সমন্বয় সাধন ও সম্প্রীতি স্থাপন করা যায়।

সকল ঐশী গ্রন্থের মাঝে কুরআন মজীদের একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ পবিত্র কিতাব নারী জাতিকে তাদের অধিকার প্রদান করেছে। এবং তাদেরকে মানব সমাজে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন করেছে। কুরআনই হচ্ছে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

কুরআনী শিক্ষার অন্যতম আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো ঃ 'বিবেকের স্বাধীনতা দান'। কোন কিছু গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। **লা ইকরহা ফিদ্দীন**-ধর্মের ব্যাপারে বল প্রয়োগ বা জবরদস্তি নেই (২ঃ২৫৭)। আর কর্মের বিষয়ে মানব সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট দায়বদ্ধ। কেবল মাত্র যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা মতাদর্শের প্রচার বা প্রবর্তন একমাত্র উপায় (৮ঃ৪৩)।

কুরআনের মতে সব ধর্মের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মূলতঃ একই ছিল, হঠাৎ এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা, পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর ইবাদত করা আর তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সৎপথে জীবন যাপন করা।

পবিত্র কুরআন যদিও তওরাত, ইঞ্জিল এবং আরো অন্যান্য গ্রন্থকে আল্লাহ্‌র বাণী বলে স্বীকৃতি প্রদান করে অর্থাৎ এ কথা জোর দিয়ে বলছে যে, ওগুলো বর্তমানে সম্পূর্ণ অকৃত্রিম অবস্থায় বিদ্যমান নেই। কালের ব্যবধানে খুব দুর্ভাগ্যজনক হলেও সেসব গ্রন্থ যা আদিতে ছিল তা মানুষ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

কুরআনের বাণীসমূহ অবতীর্ণ হয় যীশু খৃষ্টের ছ'শ' বছর পর। তওরাত ও ইঞ্জিলের বহু তথ্য ও পরিসংখ্যানের উল্লেখ ছাড়াও কুরআনে উভয় গ্রন্থের বহুল উদ্ধৃতি বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন ইতিপূর্বেকার সব ক'টি আসমানী কিতাবের উপরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য অমুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে (৪ঃ১৩৭)। এছাড়াও কুরআন সকল নবীর ওপর নাযিলকৃত আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ধর্মগ্রন্থের মাঝে কুরআনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ একজন অমুসলিমের লেখা থেকেও তা প্রমাণিত। যেমন ডঃ মরিস বুকাইলি তার দি বাইবেল দি কুরআন এ্যান্ড সাইন্স নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলেন ঃ ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের মাঝে আরেকটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। তা হলো, খ্রীষ্টানদের এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নেই যার বাণীসমূহ সরাসরি ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং যে গ্রন্থে যেই বাণীসমূহ হুবহু লিপিবদ্ধ। পক্ষান্তরে ইসলামের কুরআন এ চরিত্রেরই ধর্মগ্রন্থ। অর্থাৎ এ গ্রন্থ সরাসরিভাবে প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই প্রাপ্ত (পৃঃ-০৭)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ কুরআন হলো প্রধান ফিরিশ্‌তা জিব্রাঈলের মাধ্যমে মোহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক প্রাপ্ত ওহী তথা আল্লাহ্‌র বাণীসমূহের প্রদর্শিত রূপ। প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ওহীর বাণীসমূহ লিখে রাখা হতো। বিশ্বাসীরা তা কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন এবং নামাযে সেসব বাণী বা আয়াত তেলাওয়াত করা হতো। বিশেষত প্রাপ্ত বাণীসমূহ রমযান মাসে অবশ্যই পুরোপুরিভাবে তেলাওয়াতের ব্যবস্থা থাকতো। মোহাম্মদ (সঃ) নিজেই প্রাপ্ত বাণীসমূহ বিভিন্ন সূরায় ভাগ করে দিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে পরেই এই সব সূরা সংগ্রহ করে একত্রিত করা হয় এবং খলীফা উসমান (রাঃ)-এর শাসনামলে [সময়কালে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মৃত্যুর পর ১২ থেকে ২৪ বছর] তা গ্রন্থাকারে প্রচার হয়। আজ আমরা যে কুরআন পাচ্ছি, এ হলো সেই গ্রন্থ। অপরদিকে খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ সংকলিত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে। তাদের ধর্মগ্রন্থের বাণীসমূহ সরাসরি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নয়; বরং তা বহুগুণের বর্ণিত পরোক্ষ বিবরণী মাত্র। সত্যি কথা বলতে কি, যীশুর জীবন-বৃত্তান্ত আমরা কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর চাক্ষুষ বিবরণী থেকে পাই না। যদিও অনেক খ্রীষ্টানই মনে করে যে, বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, (দি বাইবেল দি কুরআন এন্ড সাইন্স, পৃষ্ঠা ৭)।

তিনি আরো বলেন, বৈজ্ঞানিক কৌতুহলের বহু বিষয় কুরআন উল্লেখিত হয়েছে এবং কুরআনের বাণীসমূহ বাইবেলের বাণীর তুলনায় পুরোপুরি নির্ভুল। বাইবেলে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত একটি বক্তব্য, কর্ম মাত্র কিছু সংখ্যক, কিন্তু সেগুলো বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বক্তব্য কুরআনে প্রচুর এবং তার সবগুলোই সত্যভিত্তিক। বস্তুতঃ কুরআনে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত একটি বক্তব্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেটি বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী। আমাদের আলোচ্য গবেষণায় কুরআন সম্পর্কে এ মূল সত্যই সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে (প্রাগুক্ত পৃঃ ৮)।

সুধী পাঠকবৃন্দ!

পবিত্র কুরআন মজীদ স্বীয় মর্যাদা গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা বর্ণনা করেছে তাথেকে কয়েকটি আয়াতাংশ পাঠকের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি ঃ

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন ঃ

"এবং ইহা (কুরআন) এক পরম বরকতপূর্ণ উপদেশবাণী, যাহাকে আমরা নাযেল করিয়াছি" (২১ঃ৫১)।

অন্যত্র বলেন ঃ

"এবং নিশ্চয় ইহা আমাদের নিকট উম্মুল কিতাবে আছে, যাহা অতীব মহিমান্বিত পরম হিকমতপূর্ণ (৪৩ঃ৫)।

অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ্তাআলা পুনরায় বলেন ঃ

"এবং নিশ্চয় ইহা (অর্থাৎ এ কুরআন) তোমার জন্য ও তোমার জাতির জন্য সম্মান ও গৌরবের বিষয়" (৪৩ঃ৪৫)।

অন্যত্র আল্লাহ্তাআলা বলেন ঃ

"ইহা (অর্থাৎ এ কুরআন) তাহাদের জন্যও মর্যাদার কারণ যাহারা আমার সঙ্গে আছে এবং তাহাদের জন্যও মর্যাদার কারণ যাহারা আমার পূর্বে অতীত হইয়াছে (২১ঃ২৫)।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, পূর্ববর্তীদের জন্য এমনভাবে মর্যাদার কারণ যে, পূর্ববর্তীদের (নবীদের) উপর ঈমান আনয়নকারীগণ যে মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করেছিল, কুরআন শরীফ সে সকল আপত্তিকে খন্ডন করেছে আর এভাবেই কুরআন শরীফ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য মর্যাদার কারণ হয়েছে (তফসীরে সগীর পৃঃ ৪১১)।

অন্য আর এক জায়গায় আল্লাহ্তাআলা বলেন ঃ

"(এ কুরআন) বক্ষসমূহে যাহা কিছু (ব্যাধি) আছে উহার জন্য আরোগ্য আর মু'মিনগণের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

"নিশ্চয় এ কুরআন সেই পথের দিকে পরিচালিত করে যা সুদৃঢ়" (১৭ঃ১০)।

"নিশ্চয় এর মধ্যে ইবাদতকারী জাতির জন্য পয়গাম রয়েছে"

"এবং নিশ্চয় ইহা মুত্তাকীগণের জন্য অবশ্যই সম্মানসূচক উপদেশ বাণী" (৬৯ঃ৪৯)।

"সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ" (১৬ঃ৯০)।

"নূরের উপর নূর (আলো)" (২৪ঃ৩৬)।

"মানব জাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী)-এর জন্য সুস্পষ্ট প্রমানাদিস্বরূপ" (২ঃ১৮৬)।

"কোন প্রকার মিথ্যা এর সম্মুখ হতেও আসিতে পারে না এবং এর পশ্চাৎ হইতেও নহে" (৪১ঃ৪৩)।

"ইহা হইতেছে মানব জাতির জন্য জ্যোতির্ময় দলিল-প্রমাণ এবং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী জাতির জন্য হেদায়াত ও রহমত" (৪৫ঃ২১)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো পবিত্র কুরআন মজীদের অত্যুজ্জ্বল শান মাকাম ও মর্যাদা সম্বন্ধে দলীল উপস্থাপন করছে। কুরআন ব্যতিরেকে আর এমন কোন গ্রন্থ নেই যার মাঝে মানব জীবনের সকল প্রকার শিক্ষা ও প্রয়োজন উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআন একমাত্র কিতাব যা পরিপূর্ণ এবং সমগ্র বিশ্ববাণীর জন্য প্রেরিত হয়েছে, কোন বিশেষ শ্রেণী, দেশ বা বিশেষ কোন জাতির জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর হেদায়াতের ব্যবস্থা মহান আল্লাহ্ এ পবিত্র কিতাবে প্রদর্শন করেছেন। এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকবে বা বলবৎ থাকবে।

পবিত্র কুরআন অমূল্য শিক্ষামালার আকর হওয়া সত্ত্বেও উম্মতে মুহাম্মাদীয়া এককালে এর মর্যাদাহানীর কারণ হবে বলে কুরআন থেকে জানা যায় ঃ

মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন ঃ

"এবং এই রসূল বলিবে, হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমার জাতি এ কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু বানাইয়া লইয়াছে" (২৫ঃ৩১)।

এ আয়াত যথোপযুক্তভাবে তথাকথিত মুসলমানদের প্রতি আরোপিত হতে পারে। যারা পবিত্র কুরআনকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছে এবং একে পিঠের পিছনে ফেলে রেখেছে। বিগত চৌদ্দশ' বছরে কুরআন কখনও এত উপেক্ষিত হয় নি যেমন হচ্ছে বর্তমান যুগের মুসলমান কর্তৃক। এ বিষয়ে নবী আকরম (সঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন- ইয়াতি আলান্নাসী যামানুন লা ইয়াবকা মিনাল ইসলামে ইল্লা ইসমুহু ওয়ালা ইয়াবকা মিনাল কুরআনি ইল্লা রাসমুহু। অর্থাৎ এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলামের নাম ব্যতীত আর কিছুই থাকবে না আর কুরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছু থাকবে না" (বায়হাকী বাবু শা'আবুল ঈমান)।

মুসলমান কর্তৃক কুরআন পরিত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্ তো ঘোষণা করেছেন ঃ

"নিশ্চয় আমরাই এ কুরআন নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই উহার হিফাযতকারী" (১৫ঃ১০)।

শেষ যমানায় আগমনকারী হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মাধ্যমেই যে, এ কুরআনের মর্যাদা, শান ও মকাম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে এ বিষয়ে সকল মুফাসিরই ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আগমনকারী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজেও বলেছেন, আমার আগমনের প্রধান ও মৌলিক দু'টি উদ্দেশ্য হচ্ছে "ইউহ্ই দ্দীনা ওয়া ইউকিমুশ্ শরীয়াতা অর্থাৎ আমার দ্বারা ধর্ম পুনঃ জীবিত হবে আর আমি শরীয়তকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করব।

যুগ-ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) স্বীয় দায়িত্বাবলী সতর্কভাবে সম্পাদন করেছেন। তাঁর প্রেরিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য মোতাবেক তিনি পবিত্র কুরআনকে এক "যিন্দা কিতাব" হিসাবে প্রমাণ করেছেন, আর পৃথিবীতে কুরআন করীমের সঠিক মাকাম ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন, কুরআন শরীফ এর নূরসমূহ ও কল্যাণমালা আর এর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি ও মর্যাদা জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত (মলফূযাত, ৪র্থ খন্ড, নূতন সংস্করণ ৪৫০ পৃঃ)।

অন্যত্র কুরআন শরীফ এর বরকত ও কল্যাণসমূহ সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ কুরআন শরীফ স্বীয় অনবদ্য ভাষা ও রচনাশৈলীর অনিন্দ্য সৌন্দর্য, অফুরন্ত জ্ঞান-প্রভা এবং মারেফত বা গভীর তত্ত্বোপলব্ধির প্রাচুর্য ছাড়াও নিজ কল্যাণময় সত্তার মাঝে এরূপ এক রূহানী বা আত্মিক প্রভাব রাখে যে, তার সঠিক অনুসরণে মানুষ রূহানী আনন্দে মাতোয়ারা, গোপন আলোয় উদ্ভাসিত, তার হৃদয়ে সম্প্রসারণ ঘটে, সে খোদার নৈকট্য লাভ করে স্বীকৃতি পায় আর সে খোদা কর্তৃক সম্বোধিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। তখন (কুরআন অনুসরণকারী) খোদার নূর, অদৃশ্য কৃপাকারী ও গায়েবী কল্যাণসমূহ এবং সুনিশ্চিত সমর্থন তাকে দেয়া হয় যা অন্যরা কখনই লাভ করতে পারে না।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড পৃঃ ৫০৬-৫০৭)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রচনাবলী থেকে কুরআন করীম-এর জ্যোতিঃ ও উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

তিনি (আঃ) অন্যত্র বলেন, কুরআন শরীফ বা আল্লাহ্র একত্ববাদের বীজ যেভাবে আরব, পারস্য, মিশর, সিরিয়া, হিন্দুস্তান, চীন, আফগানিস্তান, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে বপন করেছে, আর যেভাবে অধিকাংশ স্থান থেকে মূর্তি-পূজা ও নানা প্রকারের সৃষ্টি পূজার শিকড় উৎপাটিত করেছে, তা এমন এক কাজ যার দৃষ্টান্ত কোন যুগেই পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে

যখন আমরা 'বেদ'-এর দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন আমরা দেখতে পাই যে, তা শুধু আর্যাবর্তেরও সংশোধন করতে পারে নি" (চশমায়ে মা'রেফত, পৃঃ ৬৯)।

পবিত্র কুরআনের গভীর প্রজ্ঞা ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা মালা ঃ

এ সম্বন্ধে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"পবিত্র কুরআন গভীর প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। এর প্রতিটি শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আর প্রকৃত পুণ্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ ইঞ্জিল বা বাইবেলের তুলনায় অনেক দূর অগ্রবর্তী। বিশেষতঃ সত্য ও অপরিবর্তনীয় খোদাকে দেখার প্রদীপ হচ্ছে স্বয়ং কুরআন। এ পবিত্র গ্রন্থ যদি পৃথিবীতে না আসতো তাহলে খোদাই জানেন দুনিয়াতে কত অসংখ্য সৃষ্টিকে পূজা করা হত। অতএব হাজার শোকর, খোদার একত্ব বা তৌহীদ দুনিয়া থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় কুরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে" (তোহ্ফা কায়সারিয়া, পৃঃ ৪৬)।

কুরআন শরীফের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে হযরত (সঃ) বলেন ঃ আমাদের সর্বশক্তিমান খোদা, যিনি অন্তরের গোপন রহস্যাবলী অবগত তিনি এ কথার সাক্ষী যে, কোন ব্যক্তি যদি কুরআন শরীফের শিক্ষা থেকে এক পরমাণুর হাজার ভাগেরও একভাগ ত্রুটি বের করতে পারে, কিংবা এর মোকাবেলায় স্বীয় কেতাব থেকে এক অণু পরিমাণও এমন উৎকর্ষ প্রমাণ করতে পারে যা কুরআনী শিক্ষার বিপরীত বা তার চেয়ে উত্তম তাহলে আমরা মৃত্যুদন্ড কবুল করতেও প্রস্তুত" (বারাহীনে আহমদীয়া, পৃঃ ২৮৮ হাশিয়া-২)।

আজ পৃথিবীতে সকল ঐশী গ্রন্থের মাঝে কুরআন শরীফই হচ্ছে একমাত্র কেতাব যার মাঝে কোন প্রক্ষেপণ নেই, আর এর শিক্ষায়ও কোন ত্রুটি নেই। আজ যারা এ কুরআন শরীফ -এর মূল্যায়ন, বা একে আঁকড়ে ধরবে তারা সকল প্রকার অকল্যাণ ও আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। পরিশেষে রচনার কলেবর বৃদ্ধি না করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আরও দু' একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার লেখা শেষ করতে চাই ঃ তিনি (আঃ) বলেন, "তোমাদের প্রতি আর এক অত্যাবশ্যকীয় উপদেশ এই যে, কুরআন শরীফকে এক অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের মত পরিত্যাগ করিও না। কারণ কুরআনেই তোমাদের জীবন রহিয়াছে। যাহারা কুরআনকে সম্মান করিবে, তাহারা আকাশেও সম্মান লাভ করিবে। যাহারা সকল হাদীসের উপর কুরআনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, তাহাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইবে। মানব জাতির জন্য আজ কুরআন ব্যতীত আর কোন ধর্মশাস্ত্র নাই, এবং মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) ভিন্ন কোনই রসূল বা শাফী নাই" (কিশতিয়ে নূহ্ পৃঃ ২৫)।

অন্য আর এক স্থানে হযরত আকদস (আঃ) বলেন, "তোমরা সাবধান হও এবং খোদাতাআলার শিক্ষা ও কুরআনের হেদায়াতের বিরুদ্ধে এক পা-ও অগ্রসর হইও না। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট্ট আদেশকেও লংঘন করে, যে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত মুক্তির পথ শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সব গ্রন্থই ইহার প্রতিচ্ছবি ছিল।

সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে অতি গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারো সাথে তোমরা কর নাই। কেননা, যেমন আল্লাহ্তাআলা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, "আল খাইরু কুল্লুহু ফিল কুরআন" অর্থাৎ সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফে নিহিত আছে"। এ কথাই সত্য। আফসোস সেই লোকদের জন্য, যাহারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়। কুরআন শরীফ তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস। তোমাদের ধর্ম-সম্বন্ধীয় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নাই, যাহা কুরআন শরীফে পাওয়া যায় না। কেয়ামত দিবসে কুরআন শরীফই তোমাদের ঈমানের সত্যাসত্যের মানদন্ড হইবে। কুরআন শরীফ ব্যতীত আকাশের নীচে আর কোন গ্রন্থ নাই যাহা কুরআন শরীফের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া তোমাদিগকে হেদায়াত দান করিতে পারে। খোদাতাআলা তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে দান করিয়াছেন।

আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে, তাহা যদি ইহুদীদিগকে তওরাতের বদলে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদের কোন কোন ফেরকা কেয়ামতের অস্বীকারকারী হইত না। সুতরাং তোমরা এই নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহা অতি প্রিয় নেয়ামত। ইহা এক মহা সম্পদ। যদি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত তাহা হইলে দুনিয়া এক অপবিত্র মাংস পিন্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত। কুরআন শরীফ এমন একখানা গ্রন্থ। যাহার তুলনায় সকল হেদায়াতই তুচ্ছ।

"যদি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে" (কিশ্তিয়ে নূহ, ৩৯-৪১ পৃঃ)।

পরিশেষে বলতে চাই নিজ পরিপূর্ণতার কথা কুরআন নিজেই বর্ণনা করেছে **আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আত্মামতু আলায়কুম নিমাতি** (৫ঃ৪)।

অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত বা অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করলাম।

অর্থাৎ আজ আমি এ কিতাব নাযেল করার মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানকে পরিপূর্ণতার স্তরে উন্নীত করলাম এবং আমার সমস্ত নেয়ামতকে ঈমানদারদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম।

সুধী পাঠকবৃন্দ!

আজ আমরা যারা আহমদী হয়েছি, যদি আমরা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় হাবীব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভালবাসা হৃদয়ে ধারণ করে থাকি তাহলে প্রতিনিয়ত কুরআন পাঠ, কুরআনে নির্দেশাবলীর বাস্তবায়ন ও কুরআনের প্রচার কাজ যেনো আমাদের জীবনের ব্রতী হয়।

মহানবী (সঃ) কুরআন পাঠকারী ও শিক্ষাদানকারী সম্বন্ধে বলেছেন ঃ খাইরুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া 'আল্লামাহু (হাদীস)।

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে সে-ই উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শিখায়।

আসুন আমরা আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর কথার উপর পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধকারী কল্যাণ লাভে সক্ষম হই। হুযূর বলেন ঃ প্রত্যেক গৃহকর্তার জন্য অবশ্য কর্তব্য, তিনি যেন কুরআন করীমের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেন। কুরআন এর মর্মার্থ উপলব্ধির চেষ্টা করেন আপনার ঘরে যেনো এমন একজনও না থাকে যে দৈনিক গভীর মনোযোগের সাথে কুরআন শরীফ না পড়ে (খুতবা জুমুআ ঃ ২০ জুলাই, ১৯৯৭ই)।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে কুরআন বুঝে পড়ার ও আমল করার তৌফীক দিন, আমীন।

- আহমদ তারেক মুবাশ্বের
মোয়াল্লেম

শুভ বিবাহ

বিগত ২রা ডিসেম্বর, ২০০২ তারিখ দারুত তবলীগ কেন্দ্রীয় মসজিদে কুরআনের দরসের পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ কান্দিপাড়া (আহমদী পাড়া) নিবাসী জনাব আব্দুল আযীয খান সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা তাপসী রাবেয়া খানম (বেবী)-এর সাথে পাক্ষিক আহমদীর নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র আতাউল মুজিব রাশেদ-এর শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা ধার্যে। বিয়ের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিলসিলাহ্। এতে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ছাড়াও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এ বিবাহ যাতে সবদিক থেকে নব-দম্পতি ও উভয় পরিবারের জন্যে কল্যাণমন্ডিত হয় সে জন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন নির্বাহী সম্পাদক সাহেব।

- আহমদী বার্তা

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ক্রোড়াস্থ কোড়াবাড়ি গ্রামের আবু মোহাম্মদ সাহেবের সহধর্মিণী আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের কেয়ারটেকার আবু নাছির সাহেবের ভাবী জনাবা আম্বিয়া খাতুন (৫৪) প্যারাটাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে গত ২২ নভেম্বর ০২ইং রোজ শুক্রবার বেলা ৪টা ৪০ মিনিটে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহে ...রাজেউন)।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায, একাধিকবার ধর্মীয় মোখালেফাতে পরীক্ষিত, সদা হাস্যোজ্জ্বল, অতিথিপরায়ণা, পাক্ষিক আহমদীসহ জামাতী পুস্তকাদির নিয়মিত পাঠিকা, সদালাপী ও অত্যন্ত মুখলেস আহমদী মানুষটি মৃত্যুকালে ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও পুত্র বধুদ্বয় সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে করুণাময় আল্লাহ্ যেন ধৈর্য ধারণ করার তৌফীক দেন এবং মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাতসহ তাকে বিধাতা যেন জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন তজ্জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিকট খাসভাবে দোয়াপ্রার্থী।

- **আফজালুর রহমান রিপন**, কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ক্রোড়া

আখবারে আহমদীয়া

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সর্বশেষ রিপোর্টে জানানো হয়েছে, হুযূর (আইঃ) ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাঁর প্রেসার ও সুগার নিয়ন্ত্রাধীন রয়েছে।

হুযূর (আইঃ)-এর শীঘ্র পূর্ণ সুস্থতা ও দীর্ঘ কর্মক্ষম জীবনের জন্যে জামাতকে দোয়া, নফল ইবাদত ও সদকা অব্যাহত রাখার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উল্লেখ, তিনি ঈদুল ফিতরের খুতবা এবং অসুস্থতার পরে ১৩/১১/২০০২ তারিখে প্রথম জুমুআর খুতবা এবং গত মঙ্গলবার বাংলা ভাষাভাষীদের সাথে মুলাকাৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

- নির্বাহী সম্পাদক

পাক্ষিক আহমদী
১৯৩৮ সাল হতে প্রকাশিত প্রাচীনতম বাংলা পাক্ষিক আহমদীয়া মুসলিম জা'মাত, বাংলাদেশের মুখপত্র

The Fortnightly AHMADI
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh
Telephone : 7300808 Fax : 880-2-7300925
E-mail : amgb@ bol-online.com

গ্রাহক তথ্যাবলী ঃ

- ❑ আপনি কি **'পাক্ষিক আহমদী'**র পুরাতন গ্রাহক ? হ্যাঁ / না। 'হ্যাঁ' হলে আপনার চাঁদা হাল নাগাদ পরিশোধ কিনা ? না থাকলে সত্বর নিম্ন ঠিকানায় আপনার বকেয়া চাঁদা (বাংলাদেশের জন্য বাৎসরিক টাকা ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ), ভারতে টাঃ ২০০/= এবং অন্যান্য দেশের জন্য $ ১০০ মার্কিন ডলার (100 US $) হিসাবে) মনিঅর্ডার যোগে বা ডিডি-র মাধ্যমে পরিশোধ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ গ্রাহক হতে ইচ্ছুক নির্ভুল ঠিকানা সহ উপরোক্ত হারে গ্রাহক চাঁদা পাঠালে **পাক্ষিক আহমদী** নিয়মিত পাঠানো হবে।
- ❑ কোন গ্রাহক **'পাক্ষিক আহমদী'** নিয়মিত পাচ্ছেন না এমন ক্ষেত্রে চাঁদা পরিশোধের তারিখসহ রশিদ নং এবং অন্য কোন অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে নিম্ন ঠিকানায় জানাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ দেশে এবং বিদেশের সম্মানিত পাঠকদের কাছে আমরা পাক্ষিক আহমদীতে ছাপানোযোগ্য লেখা/ছবি/ঐতিহাসিক ছবি ইত্যাদি **'সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী**, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১, বাংলাদেশ **'Editor, Fortnightly The AHMADI,** 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh Fax : 880-2-7300925, E-mail : amgb@ bol-online.com এ ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
- ❑ ঠিকানা পরিবর্তন হলে সাথে সাথে জানাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ পাক্ষিকের চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

গ্রাহকের পূর্ণ ডাক ঠিকানা ঃ

নাম ঃ .....

গ্রাম ঃ .....

ডাকঘর ঃ ..... (পোষ্ট কোড নং) .....

জেলা ঃ .....

** বহির্দেশের গ্রাহকদের বেলায় ঠিকানা ইংরেজীতে লেখার অনুরোধ করা যাচ্ছে।*

৪ দিন ব্যাপী তা'লীমী ক্লাস অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত চরসিন্দুর ও মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চরসিন্দুরের উদ্যোগে গত ৩০ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক তা'লীম ও তরবিয়তি ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত ক্লাসে আতফাল ৬ জন, নাসেরাত ৪ জন, অন্যান্য আহমদী ৬জন অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তা'লীম দেন স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। ক্লাস শেষে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়।

- **মফিজ উদ্দিন আহমদ**, প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চরসিন্দুর

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ায় ৭দিন ব্যাপী ১৮তম তা'লীম ও তরবিয়তি ক্লাস সম্পন্ন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ায় ৭দিন ব্যাপী ১৮তম তা'লীম ও তরবিয়তি ক্লাস ২৭ নভেম্বর ০২ তারিখে সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

২১ নভেম্বর বাদ ফজর থেকে উক্ত ক্লাসে ২০ জন খাদেম ও ১৪ জন আতফাল সহ মোট ৩৪ জন নিয়মিত ক্লাসে অংশ নিয়েছে।

- **আফজালুর রহমান রিপন**, কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ক্রোড়া

ওয়াকফে নও সম্মেলন

ওকীল ওয়াকফে নও মোহতরম সৈয়্যদ কমর সোলেমান সাহেবের আগমনে গত ১৬/১১/০২ইং রোজ শনিবার তারুয়ার মসজিদে বাশারত প্রাঙ্গণে অত্র অঞ্চলের ওয়াকফে নও শিশু ও তাদের পিতা-মাতা সমন্বয়ে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, মোহতরম ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব। উক্ত অনুষ্ঠানে অত্র অঞ্চলের ৬টি জামাত - তারুয়া, ঘাটুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তালশহর, শালগাও ও দূর্গারামপুরের মোট ৪০ জন শিশু ও ১০০ জন পিতামাতা উপস্থিত থেকে ওকীল ওয়াকফে নও সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ও নসিহত শ্রবণ করেন। সকাল ৯-৩০ হইতে ১২.০০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সভার প্রথমেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ওয়াকফে নও শিশু তকদীর আহমদ, উর্দূ নযম পাঠ করেন ওয়াকফে নও শিশু এস এস সুলতান। অতঃপর বিভাগের রিপোর্ট পেশ করেন মোহতরম মোস্তাক আহমদ খন্দকার, বিভাগীয় সহ-সেক্রেটারী, চট্টগ্রাম বিভাগ। তিনি ওকীল ওয়াকফে নও সাহেবের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন। পরিশেষে ওকীল ওয়াকফে নও মোহতরম সৈয়্যদ কমর সোলেমান সাহেব আগত ওয়াকফে নও শিশু ও তাদের পিতা মাতাদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

- **মোস্তাক আহমদ খন্দকার**

মীরপুর মসজিদে ঈদের জামাতে মুসল্লীদের একাংশ।
খুতবা দিচ্ছেন হাফেয সেকান্দর আলী সাহেব - ফটো ঃ সুমন

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD
CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রূপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৮৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ময়মনসিংহে ওয়াকফে-নও শিশুদের সাথে মোহতরম সৈয়দ কমর সুলেমান, ওকিল ওয়াকফে নও, মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ও তাঁর সফরসঙ্গী এবং স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যবৃন্দ

New Vo. No. 65 ◆11th Issue December 15, 2002 ◆Tk. 10.00

Fortnightly The AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

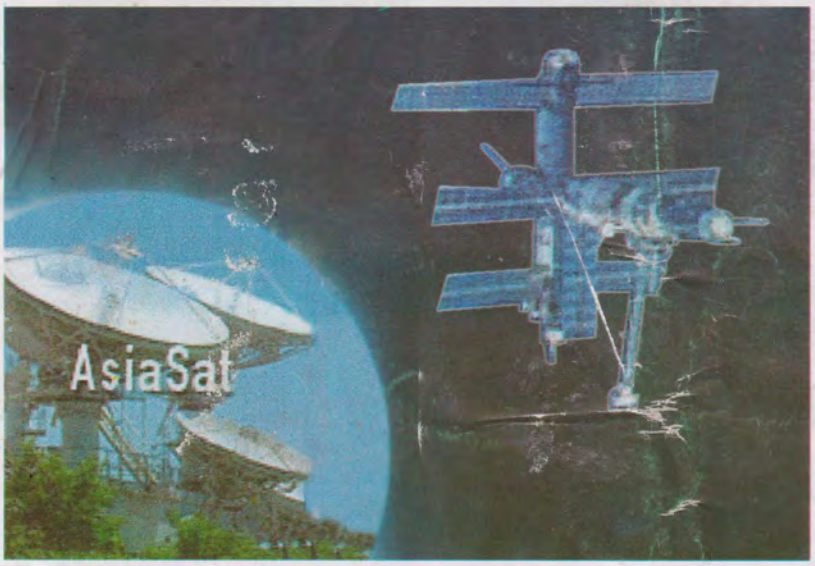

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com